১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন

মুনতাসীর মামুন

মুনতাসীর মামুন

জার্নিম্যান
বুকস্

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
ও বাংলাদেশ চর্চার সহযোগিতায়

১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন

শিল্পী হাশেম খানের ২৪টি ড্রইংসহ বাংলাদেশের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীদের ড্রইং ও চিত্রের প্রতিলিপি-শিল্পীরা হলেন :
কামরুল হাসান, এস.এম. সুলতান, আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, মুর্তজা বশীর, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আব্দুর রাজ্জাক,
ধীরাজ চৌধুরী, মুস্তাফা মনোয়ার, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, ভূপেন সেন, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, মাহমুদুল হক,
কালিদাস কর্মকার, আব্দুর শাকুর শাহ্, হামিদুজ্জামান খান, বীরেন সোম, স্বপন চৌধুরী, মতলুব আলী, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী,
সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, শাহাবুদ্দিন, মুনসুর-উল-করিম, নাজলী লায়লা মনসুর, ফরিদা জামান, কাজী রকিব,
মোহাম্মদ ইউনুস, ঢালি আল মামুন, নাসরীন বেগম, কনকচাঁপা চাকমা, অমিত নন্দী, উজ্জ্বল ঘোষ,
তামিনা হাফিজ লিসা, শিবানন্দ আধকারী বিপ্লব, সুমন কুমার বৈদ্য, সুমা দেবী মন্ডল, সিগমা হক অংকন,
সাধন মজুমদার, মোঃ মনিরুজ্জামান, আলাউদ্দিন আহম্মেদ বুলবুল,

আলোকচিত্র শিল্পীর তালিকা
কিশোর পারেখ, বীরেন সেনগুপ্ত, রঘু রাই, রশীদ তালুকদার, আনোয়ার হোসেন, নিখিল ভট্টাচার্য,
এম. এস. শফি, হারুন হাবিব, শ্যামাদাস বসু ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ

প্রকাশকাল
বিজয় দিবস, ২০১৪

প্রকাশক
জার্নিম্যান বুকস্
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট,
[বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী]- এর পক্ষে
ট্রাস্টি তারিক সুজাত

প্রচ্ছদ ও বই নকশা
তারিক সুজাত
প্রচ্ছদে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শহীদ ডা. ফজলে রাব্বীর মরদেহের চিত্রের প্রতিরূপ ব্যবহৃত হয়েছে

পরিবেশক
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ
সুবর্ণ

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ, ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য: ১,২০০ টাকা

ISBN : 978-984-91440-8-3

১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন

২৫ মার্চ রাত '৭১, ড্রইং: হাশেম খান, ২০০৮

গণহত্যার '৭১ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, ড্রইং: হাশেম খান, ২০১০

উৎসর্গ

৩০ লক্ষেরও বেশি শহীদ
৬ লক্ষেরও বেশি নির্যাতিতা মুক্তিযোদ্ধা ও
অগণিত অপমানিত নির্যাতিত
নিগৃহীত বাঙালির স্মরণে

হত্যাযজ্ঞ, তেলরং : এস. এম. সুলতান, সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ তেমনভাবে মূল্যায়িত হয়নি। হলে, মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ বছরের মাথায় মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেটিভ বদল হতো না। আমাদের মানসিকতায়ও ঝামেলা আছে। না, হলে ১৯৭৫ সালে মুক্তিযোদ্ধারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতেন না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আমরা যাদের চিহ্নিত করি, তারা ক্ষমতায় এসেছেন কিন্তু প্রবলভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/উপাদান সংরক্ষণ করেননি। তাই আজ, চার দশক পর মুক্তিযুদ্ধের মৌল বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম ধাপ ইতিহাসের ন্যারেটিভ। ১৯৪৭ সালের আগে ভারতের মুসলিম নেতারা ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন। তারা মুসলমান নৃপতিদের কথা তুলে ধরেছেন যারা শৌর্যে-বীর্যে ছিলেন অতুলনীয় এবং মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, ভারতীয় মুসলমানরা তাদেরই বংশধর। ইসলামী শাসকদের আমল ছিল স্বর্ণযুগ। ব্রিটিশ ও হিন্দুদের চক্রান্তের কারণে আজ তারা হীনবস্থায়। এই অবস্থা থাকবে না যদি মুসলমানদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা হয়। ইতিহাসের এই ব্যবহার মুসলমান তরুণদের সংগঠনে ভূমিকা রেখেছিল এবং পাকিস্তান মানসিকতা তৈরি করেছিল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, পাকিস্তান : ইসলাম। ভারত : হিন্দু।

এই ন্যারেটিভ ভাঙতে বিপরীতে বঙ্গবন্ধুকে সোনার বাংলার মিথের কথা বলতে হয়েছিল। নানা বঞ্চনার কথা তুলে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংহত করেছিলেন। পোস্টারে লেখা হয়েছিল, সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

১৯৭১ সালের বিজয়ের পর দাঁড়াল বাঙালিদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এই রাষ্ট্র সেক্যুলার। এই রাষ্ট্রে থাকবে সিভিল কর্তৃত্ব। এই রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা আছে ৩০ লাখ শহীদ, ৬ লাখ বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা, অগণন আহত-প্রায় সব বাঙালির আত্মত্যাগ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং সবশেষে তাজউদ্দীন আহমদের বাংলাদেশ সরকার। ন্যারেটিভের অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং স্বাধীনতা বিরোধীরা পরিত্যাজ্য।

জিয়াউর রহমান ও সামরিক বাহিনী, এরশাদ ও সামরিক বাহিনী এবং খালেদা জিয়া আবার এই ন্যারেটিভ বিনষ্ট করতে চেয়েছেন। জিয়া ১৯৪৭ সাল ফিরিয়ে আনলেন। অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে এই ন্যারেটিভ চাপিয়ে দিলেন। বলা হলো, ধর্ম প্রধান, রাষ্ট্র হবে ধর্মীয়; এই রাষ্ট্র হবে মুসলমানদের, রাজাকার আর আলবদররা কেন পরিত্যাজ্য হবে? তারা আমাদের সহযাত্রী, অর্থাৎ ১৯৭১ সালে হত্যা ধর্ষণ কিছুই হয়নি। এই তত্ত্বে নতুন প্রজন্মকে বিশ্বাসী করার জন্য শান্তি কমিটির সদস্যকে প্রেসিডেন্ট, স্বাধীনতা বিরোধী দালালদের প্রধানমন্ত্রী, সিনিয়র মন্ত্রী; রাজাকার, আলবদরদের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী বানানো হলো। গত ৩০ বছর এই তিনজন এ কাজটি করেছেন। দুটি নতুন প্রজন্ম এই ন্যারেটিভে বিশ্বাস করে। পুরনোদের অনেকে এটি মেনে নিয়েছে।

যেটা মুক্তিযুদ্ধপন্থীরা জানে না কিন্তু বিরোধীরা জানে, তা হলো, ইতিহাসের সূত্র ছিন্ন করে দিতে হবে যাতে মনোজগতে ইতিহাসের সত্য স্থান না পায়, যেটি করা হয়েছে পাকিস্তানে। সরকারও এ বিষয়ে খুব আগ্রহী এমন বলা যায় না বর্তমানে। কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী। কপাল আমাদের! ইতিহাসের অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল, আর সেই অধিকার যাতে আমরা ফিরে পাই সে প্রচেষ্টাই এখন আমাদের মুখ্য।

এই পটভূমি দিতে হলো, দীর্ঘ হলেও একটি কারণে। আমরা যা হারিয়েছিলাম তা আইনগতভাবে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার বিষয়ক ট্রাইব্যুনাল। এর আগে বিচারপতি খায়রুল হকও দুটি রায়ে ১৯৭১ সালের ন্যারেটিভকেই সত্য বলেছিলেন, কিন্তু তার দিকে দৃষ্টি পড়েছে কম। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এখন দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সব ধরনের রাজনীতির জন্য।

ট্রাইব্যুনাল ইতোমধ্যে গোলাম আযম, আলী আহসান মুজাহিদ, কামারুজ্জামান, কাদের মোল্লা, বাচ্চু রাজাকার, আশরাফুজ্জামান খান, চৌধুরী মুঈনুদ্দীন, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আব্দুল আলীম, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মতিউর রহমান নিজামী ও মীর কাশেম আলী খানের রায় দিয়েছে। প্রথম সারির অপরাধীদের রায় দেওয়া সম্পূর্ণ হলো। এখানে গোলাম আযম, কাদের মোল্লা এবং আলীমকে শুধু ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়নি, বাকি সবাই মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া

হয়েছে। সবাই সুপ্রিম কোর্টে গেছেন। সুপ্রিম কোর্ট শুধু কাদের মোল্লা ও কামারুজ্জামানকে ফাঁসির রায় দিয়েছে। সাঈদীর সাজা কমানো হয়েছে।

এই রায়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য কারণ, এই সব রায়ের মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের অধিকার ফিরে পেয়েছি। গত তিন দশক মনোজগতে আধিপত্যটা এমনভাবে হয়েছে যে প্রচলিত চিন্তার বাইরে বের হওয়া অনেক বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। এই সব রায়ে ইতিহাসের সত্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এখানেই এই ট্রাইব্যুনাল ও রায়ের গুরুত্ব।

প্রতিটি রায়ে ভূমিকাংশ মোটামুটি এক। প্রথম রায়ে জামায়াতকে অভিযুক্ত করার পর পরবর্তী রায়গুলোতে এই বিষয়টিকে আরো বিশদ করা হয়েছে। তারপর প্রত্যেকের অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিছু অভিযোগ টেকেনি। কিন্তু যে সব অভিযোগ টিকেছে এবং বিশ্লেষিত হয়েছে তাতে ফুটে উঠেছে একাত্তরের রক্তাক্ত চিত্র– অপহরণ, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ, হিন্দু ও আওয়ামী লীগ সদস্যদের নির্দিষ্ট করে খুন। রায়গুলো একদিকে সেই সময়ের দলিল যা আমাদের স্মৃতি থেকে অবলোপনের চেষ্টা করা হয়েছে ১৯৭৫ সাল থেকে, লে. জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমল থেকে এবং তা ধীরে ধীরে জোরদার করা হয়েছে লে. জে. হুসাইন মোহাম্মাদ এরশাদ এবং সব শেষে বেগম খালেদা জিয়া ও মতিউর রহমান নিজামীর আমলে। বেগম জিয়া ইতিহাসের দলিল বদলে দিয়েছিলেন নিজের স্বামীকে স্বাধীনতার 'ঘোষক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রায়গুলো ১৯৭৫ পরবর্তী ন্যারেটিভগুলি নাকচ করে দিয়েছে এবং সে কারণে সবকটি রায় গুরুত্বপূর্ণ। এ রায়গুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কারণ, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তার এ দেশীয় সহযোগীদের নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড, গণহত্যা। কারণ, অভিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির মূল অপরাধ গণহত্যা সংগঠন ও তাতে অংশগ্রহণ। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধের মৌল বৈশিষ্ট্য– গণহত্যা ও নির্যাতন। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য আমরা চার দশক আন্দোলন করেছি। অবশেষে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের ঘটনা প্রথম। ট্রাইব্যুনাল বা যুদ্ধাপরাধ বিচারের বিরোধিতা করে বিএনপি-জামায়াত। এ কারণে,

১৯৭১ স্মরণে, তেলরং, সৈয়দ জাহাঙ্গীর
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

আওয়ামী লীগ ও জোট মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিএনপি-জামায়াত ও জোট পরিচিত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে। বিচার চলছে, রায় হচ্ছে, আপীল হচ্ছে। আপীলের রায় একটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যকর হচ্ছে।

ট্রাইব্যুনালে এখন বিপুল পরিমাণ নথিপত্র জড়ো হয়েছে। ইতিহাসের এই দিকটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। তদন্ত দল গণহত্যার বিপুল পরিমাণ দলিল-দস্তাবেজ হস্তগত করেছে। এগুলো আমাদের ইতিহাসের ঐতিহ্য, অংশ। ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ জানাব, এসব নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য এখনই বিধিব্যবস্থা করা উচিত। ১৯৭২-৭৩ সালে সংগৃহীত সব দলিল-দস্তাবেজ হারিয়ে গেছে এবং স্বাধীনতাবিরোধীরাও প্রণালীবদ্ধভাবে সব বিনষ্ট করে ফেলেছে। সরকারের কাছে আগেও আবেদন করেছি, এখনও করছি; পুরনো হাইকোর্ট ভবনে এসব নথিপত্র সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করে 'গণহত্যা জাদুঘর ও আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করুন। এটিই উপযুক্ত জায়গা। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্র। এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও ছাত্ররাই প্রথম হানাদার পাকিস্তানি বাহিনির হাতে শহীদ

হয়েছিলেন। ইতিহাসের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার এটি একটি উপাদান।

আমাদের এই দাবিটি যেহেতু এখনও বিবেচনা করা হচ্ছে না, তাই, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর উদ্যোগে খুলনায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে '১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর'। ইতোমধ্যে এ উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয়েছে, কয়েকটি অচিহ্নিত গণকবর চিহ্নিত করে ফলক লাগানো হয়েছে, গণহত্যা-নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ শুরু হয়েছে। এভাবে গণহত্যা-নির্যাতনের ন্যারেটিভটিকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মৌল উপাদান হিসেবে সংরক্ষণ করতে চাই।

গণহত্যাকে আমাদের ইতিহাসের ন্যারেটিভ বা বয়ান থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করেছে এক সময় সামরিক বাহিনী, বিএনপি এবং জামায়াত, গণহত্যা ন্যারেটিভ থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্ব, আমেরিকা, চীন গণহত্যা সমর্থন করেছিল। সে কারণে তারা বাংলাদেশের গণহত্যাকে এড়িয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের গণহত্যাবিষয়ক কোনো গ্রন্থে বাংলাদেশের গণহত্যার কোনো উল্লেখ নেই, ভাবা যায়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের আর কোথাও এত

গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১, জলরং, রফিকুন নবী
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

কম সময়ে এত বিশাল গণহত্যা হয়নি। গণহত্যার কথা ভুলে গেলে আমাদের স্বাধীনতার বয়ানে আর সত্যতা থাকে না। ইতিহাস বিকৃত হয়। ইতিহাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সাধারণ মানুষ।

ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের রায় আমাদের ইতিহাসে গণহত্যা শব্দটি ফিরিয়ে এনেছে। ত্রিশ লাখ বা তার বেশি শহীদ হয়েছিলেন এটিই সত্য। এটি অস্বীকার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় আনা উচিত। ইউরোপে 'হলোকাস্ট' অস্বীকার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমাদের প্রস্তাব, আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি অটুট রাখা ও সারা পৃথিবীর গণহত্যায় নিহতদের স্মরণার্থে ১ মার্চ অথবা ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা। ১ মার্চের কথা বললাম এ কারণে যে, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান গণহত্যার প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং ঐ সময়ে প্রায় ৩০০ জনকে তারা হত্যা করেছিল। ২৫ মার্চ তো ব্যাপক আকারে গণহত্যা শুরু হয়। আমরা আহ্বান জানাব, সরকার না চাইলেও আমরা এ দু'টি দিনের যে কোনো একটি গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন শুরু করি। কাউন্টার ন্যারেটিভের বা বয়ানের জন্য এটি প্রয়োজন।

সমসাময়িককালে অনেকে নানা কারণে পরিচিতি লাভ করেন। বিখ্যাত হন। কিন্তু সময় এত নিষ্ঠুর যে, কালের ক্যানভাসে কিছুই থাকে না। যেমন ৫০ বছর পর বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হলে জাতির পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের নাম থাকবে। কোনো মেজরের নাম থাকবে না। শেখ হাসিনার নাম থাকবে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের কালের জন্য নয়, অন্য কারণে। সেটি হলো, বাংলাদেশে বিচারহীনতার ও দায়হীনতার যে সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল তিনি তা থেকে বেরিয়ে দায়বদ্ধতার সংস্কৃতির চর্চা শুরু করেছিলেন যা সভ্য সমাজের সংস্কৃতি। আর বিচারিক ইতিহাসে ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২-এর রায় বারবার উল্লিখিত হবে রাষ্ট্রে দায়বদ্ধতা ও রাষ্ট্রের মানুষদের কাছে ইতিহাসের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

শুরুতে মনোজগতে আধিপত্যের কথা উল্লেখ করেছিলাম। সে প্রসঙ্গটি আবার আলোচনায় আনতে চাই। পাকিস্তান ঔপনিবেশিক আমলে আমরা বড় হয়েছি। যে পাঠ্য বই পড়েছি তাতে

বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ ১৯৭১
ড্রইং : ধীরাজ চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধের শপথ ১৯৭১
ড্রইং : সমরজিৎ রায় চৌধুরী, ১৯৯৩
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

পাকিস্তানবাদের কথাই জেনেছি। মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল পাকিস্তান। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে সেখানে চিড় ধরল। যৌবনের প্রারম্ভে আস্তে আস্তে মনোজগত থেকে পাকিস্তান হটে যেতে লাগল। সেখানে স্থান করে নিতে লাগলেন বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। আমাদের জেনারেশনের প্রায় সবাই তখন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হলো। বঙ্গবন্ধুর ডাক, সোনার বাংলা আমাদের মনোজগত এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, বাংলাদেশের জন্য ৩০ লাখ আত্মোৎসর্গ করতে দ্বিধা করেনি।

আমাদের জেনারেশন [যাদের বয়স ৬০-এর কোঠায়] পাকিস্তান কীভাবে জয় করা হয়েছিল সেই বয়ানের মধ্যে বড় হয়েছি। ১৯৭১ সালে সোনার বাংলা স্বপ্নে আমরা বিভোর ছিলাম, যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছি এটাও ঠিক, কিন্তু সেই ন্যারেটিভ বা বয়ানে কি আমাদের যুক্ততা ছিল? থাকলে ১৯৭৫ সালের ঘটনার পর যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা কেন জিয়াউর রহমানকে 'বিকল্প নেতা' হিসেবে মেনে নিলেন? সুযোগ-সুবিধার একটি বিষয় ছিল ঠিকই, কিন্তু তাই কি সব? জিয়াউর রহমান যে বিষয়টি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে বলতে চেয়েছিলেন তা'হলো, ১৯৪৭ ঠিক। ১৯৭১ বিচ্যুতি। সেই বিচ্যুতি

অপসারণ করা হয়েছে যাতে ১৯৪৭-এর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থাকে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত যারা দেশ শাসন করেছেন তারা এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

১৯৭৫ সাল থেকে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানবাদ সে সময়ের জেনারেশনের মনোজগত আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল। গত তিন দশক এই আধিপত্য বিস্তারের জন্য শাসকরা নানা মাধ্যম ব্যবহার করেছে। সেগুলি হলো, অস্ত্র, অর্থ, সংবাদ মাধ্যম, পাঠ্য বই, সরকারি প্রবল প্রচার [তখন একমাত্র বাংলাদেশ টেলিভিশনই ছিল] রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। যে ন্যারেটিভ আমরা নির্মাণ করেছিলাম সেই ন্যারেটিভে একমাত্র বীর হিসেবে স্থান করে নিলেন জিয়াউর রহমান। বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ, সাধারণ মানুষের অবদান, ৩০ লক্ষ শহীদ সব হারিয়ে গেলেন। এই বয়ানে বিএনপি ও জামায়াত আদর্শিক দল হিসেবে পরিগণিত হলো, যুদ্ধাপরাধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অন্তর্হিত হলো।

জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি নষ্ট করার জন্য সংবিধান কয়েকবার সংশোধন করলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের একরকম জাতির বীর ঘোষণা করা হলো। ভাবা যায়? এবং আরো

অজানা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা, এচিং অ্যাকুয়াটিন
শিল্পী : কালিদাস কর্মকার
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

আশ্চর্য বাংলাদেশের মানুষদের একটি অংশ তাকে গ্রহণ করল। জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ যে কোনো আদর্শ নয় তা প্রমাণ করার জন্য বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলিকে মুক্ত করলেন। রাজাকারদের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বানালেন।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ ৭০ ভাগ ভোট পেয়েছিল, ধরে নিতে পারি যারা বাংলাদেশ চায়নি তাদের হার ছিল ২০ ভাগ। জিয়াউর রহমানের আমল থেকে এ হার বাড়তে থাকে। কারণ, তিনি তাদের ক্ষমতার ও অর্থনীতির অংশীদার করে শক্ত ভিত্তি দিয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থে জিয়াউর রহমানের মতো বাংলাদেশের ক্ষতি আর কেউ করেননি।

এরশাদ একইভাবে সেই ধারা এগিয়ে নিলেন এবং রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করে কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিলেন। খালেদা জিয়াও একইভাবে সেই ধারা এগিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত বদল করে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয় টার্মে এসে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র বদলালেন, জামায়াতকে ক্ষমতায় নিয়ে এলেন। এথনিক ক্লিনজিং করলেন। তার আমলে হত্যা ধর্ষণ চোরাচালান দুর্নীতি চরমভাবে বৃদ্ধি পায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমূলে মূলোৎপাটন করার জন্য তিনি সরকার প্রধান হয়ে শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য গ্রেনেড হামলা করালেন ২১ আগস্ট। বাংলাদেশকে জঙ্গী তালেবানী রাষ্ট্র করার জন্য হঠাৎ বাংলাদেশে প্রায় ১০০টি জঙ্গী সংগঠন গঠনে প্রশ্রয় দেওয়া হলো। বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিত হয়ে উঠলো জঙ্গী রাষ্ট্র হিসেবে। জিয়াউর রহমানের যাবতীয় ইচ্ছার পূর্ণতা দিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতায় এনে ৩০ লাখ শহীদ ও ৬ লাখ বীরাঙ্গনাকে এক ধরনের চপেটাঘাত করলেন তিনি। আমরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলাম, ইতিহাসে যে অধিকার ছিল তার আমলে হঠাৎ দেখলাম তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধী কাদের মোল্লার দণ্ডের পর হঠাৎ তরুণদের সমাবেশ ঘটল ঢাকার শাহবাগে। বিভিন্ন মফস্বল শহরেও ছোট ছোট শাহবাগ তৈরি হলো। দীর্ঘ এক মাস শাহবাগে বিশাল সমাবেশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজনকে আবার উজ্জীবিত করেছিল। তারা সরাসরি জামায়াতের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।
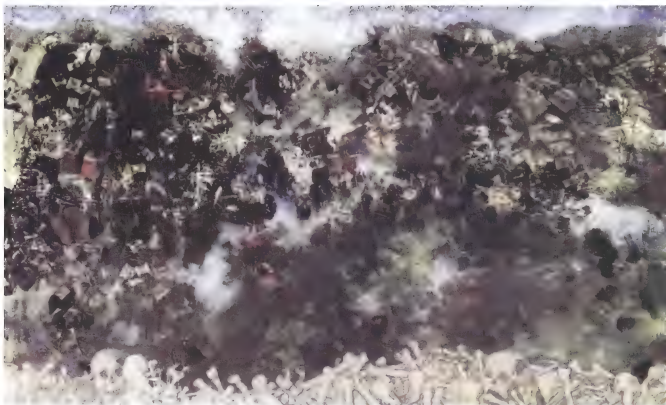
গণহত্যা, তেলরং, আমিনুল ইসলাম
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

এখানে একটি বিভ্রান্তি ঘটেছে। তারা বেড়ে উঠেছে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার আমলে। তাদের পিতা-মাতাদের অনেকে হয়ত ছিলেন জিয়ার অনুসারী। তারা বিএনপির বিরুদ্ধে কোনো শ্লোগান দেয়নি। তাদের মনোজগতে বিএনপির জন্য সুপ্ত একটি সমবেদনা আছে যা আমরা গোঁড়া বামপন্থিদের মধ্যে লক্ষ্য করি। কিন্তু, জামায়াতের প্রধান শক্তি বিএনপি যুদ্ধাপরাধ বিচার সমর্থন করেনি। যে যুদ্ধাপরাধ সমর্থন করে না সে ১৯৭১ সালের গণহত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচার স্বীকার করে না। অর্থাৎ সে ১৯৭১ সালের বিরোধী, বড় সমাবেশ দিয়ে উজ্জীবিত করা যায় কিছু দিন কিন্তু মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করা যায় না। কিন্তু, যে জেনারেশন উজ্জীবিত হয়েছে তাদের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের কাজটি করা যেত। তাদের মাঝে আবার সেই ইতিহাস ফিরিয়ে আনা যেত। এর বড় মাধ্যম ছিল প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনে প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক অবস্থা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রম আমাদের হতাশ করছে। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করছি, সরকার হেলায় সেই আধিপত্য বিস্তারের সুযোগটি নিচ্ছে না।

কে কী করলেন বা করলেন না তার সালতামামি আমরা দিতে চাই না। আমরা কী করতে পারি সেটিই বড় করে দেখতে চাই। ওপরে যে পটভূমি উল্লেখ করেছি তাতে মনে করি ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও নির্যাতনের ওপর আমাদের আরো গুরুত্ব দেয়া উচিত। যত আমরা ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও নির্যাতনের ওপর গুরুত্ব দেব তত ভবিষ্যত প্রজন্মের বিভ্রান্তি ঘুচবে, আমাদেরও। আর এ কারণেই আমরা গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের কাজ শুরু করেছি আর এ কারণেই এর পক্ষ থেকে আলোকচিত্র সম্বলিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করছি।

এখানে যে সব আলোকচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে আলোকচিত্রীর কোনো নাম নেই। গত ৪৪ বছর বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছে, এখন অন্তর্জালেও আছে। এখানে কপিরাইট ও স্বত্বের বিষয়টি উহ্য হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসার কারণে এ নিয়ে কখনও প্রশ্ন ওঠেনি। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চিত্রগ্রাহক কিশোর পারেখকে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান করে। তার পুত্র পরলোকগত পিতার পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'বিমানবন্দর থেকে আসার পথে আমার পিতার তোলা অনেক ছবি পোস্টার আকারে দেখেছি। আমার ভালো লেগেছে, না, এখানে কপিরাইটের কথা তুলছি না,

তবে, আলোকচিত্র শিল্পীর নামটা থাকলেই যথেষ্ট।' আমরা যে সব ছবির আলোকচিত্রীর নাম পেয়েছি তাদের নাম দিয়েছি। বিভিন্ন গ্রন্থ/সংকলন/অন্তর্জাল থেকে আমরা এগুলি সংগ্রহ করেছি। চিত্রগ্রাহকদের আমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য।

আমাদের শিল্পীরাও বিভিন্ন সময় গণহত্যা-নির্যাতন নিয়ে ছবি এঁকেছেন। ভারতেও সেই সময় অনেকে এঁকেছেন। আমরা কখনও সেই সব চিত্রকলার আলোকচিত্র সংরক্ষণ করিনি। আমি এখানে চেষ্টা করেছি আমাদের শিল্পীদের আঁকা গণহত্যা ও নির্যাতন নিয়ে চিত্রের একটি সংকলন করার। বিভিন্ন সংকলন থেকে [প্রায় সংকলনে উৎসের কোনো উল্লেখ নেই] এগুলি সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সাদাকালো-র স্মরণিকা ও এ্যালবাম। যাদের ছবির আলোকচিত্র ছেপেছি তারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

একটি লেখা যা না বলতে পারে, একটি ছবি মুহূর্তে তার চেয়ে বেশি বলতে পারে। আর এ কারণেই আমরা গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভের পক্ষ থেকে এই আলোকচিত্র সংকলনটি প্রকাশ করছি। এই জাদুঘর ও আর্কাইভ শুধু নয়, এ আলোকচিত্র সংকলনটিও আমাদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেবে, স্বাধীনতা শুধু চার অক্ষরের শব্দ মাত্র নয়। এর পেছনে আছে ৩০ লক্ষেরও বেশি শহীদদের রক্ত, ৬ লক্ষেরও বেশি নারীর অশ্রু, অগণিত নির্যাতিতের দুঃখ বেদনা।

সংকলনটির বই নকশা থেকে শুরু করে প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন ইতিহাস সম্মিলনীর সদস্য ও '১৯৭১ ঃ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ট্রাস্টে'র ট্রাস্টি কবি তারিক সুজাত। আমাদের ট্রাস্টি শিল্পী হাশেম খান তার ১৯৭১ ড্রইং-এর চিত্রমালা থেকে আমাদের প্রকাশের জন্য দিয়েছেন ২৪টি ড্রইং। আমি তাদের ও সম্মিলনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের এ জন্য ধন্যবাদ জানাই।

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা
বিজয় দিবস, ২০১৪

গণহত্যার আগে, তেলরং, কামরুল হাসান, ১৯৭১
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর

গণহত্যার পরে, তেলরং, কামরুল হাসান, ১৯৭১
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর

১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা যে গণহত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছিল বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। গণহত্যার মধ্যে অন্তর্গত বিভিন্ন মানুষকে অকারণে হত্যা। জাতিগত বিদ্বেষ, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হত্যা। হানাদারদের কারণে মানুষকে বাস্তুত্যাগ করতে হয়েছে। আশ্রয়ের খোঁজে যাওয়ার সময় ভয়ে আতঙ্কে, অসুস্থতা, জখম হওয়ার কারণে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় পাবার পরও মহামারি ও নানা কারণে মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। এসবই গণহত্যার মধ্যে অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যার কথা উঠলে গুরুত্ব আরোপ করা হয় ডিসেম্বর মাসে [১৯৭১] ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার ওপর। কিন্তু সেটি গণহত্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র।

ঘরবাড়িতে ঢুকে হত্যা, বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে হত্যা, রাস্তা-ঘাটে হত্যা– বিভিন্ন উপায়ে সে সময় মানুষ হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় পাড়া, গ্রামের মানুষকে একত্রিত করে হত্যা করা হয়েছে। কখনও কখনও নির্দিষ্ট একটি জায়গায় মানুষ এনে হত্যা করা হতো, যেমন, রায়ের বাজার বা মিরপুরের জলাভূমিতে। নদীর তীর, নদীর ওপর পুলের সিঁড়িও গণহত্যার জন্য ঘাতকরা বেছে নিয়েছিল। এ সমস্ত জায়গা আমাদের কাছে পরিচিত বধ্যভূমি হিসাবে। অনেক সময় কিছু মানুষকে হত্যা করে একই সঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। এ সব কবর আমাদের কাছে গণকবর হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের গণহত্যায় ৩০ লক্ষের ওপরে মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আমি ১২ খণ্ডে *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* সম্পাদনকালে একটি খণ্ড শুধু করেছি বধ্যভূমি, গণকবর ও নির্যাতন কেন্দ্রের ওপর। এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা গেছে প্রায় ১০০০ গণকবর ও বধ্যভূমি। এখনও গণকবর ও বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হচ্ছে। গত ৪৩ বছরে জনসংখ্যা ও বসতি বৃদ্ধির কারণে অনেক বধ্যভূমি ও গণকবরের চিহ্ন অপসৃত হয়েছে। নদী ভাঙনের কারণেও অনেক গণকবর, বধ্যভূমি হারিয়ে গেছে।

নির্যাতনের পরিধি ব্যাপক। প্রতিদিন হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসররা বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করেছে। তারপর হত্যা করেছে। অল্পসংখ্যক মানুষ নির্যাতন কেন্দ্র থেকে ফিরে আসতে পেরেছেন। সব বয়সের নারীরা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে আটকে রেখে নিয়ত ধর্ষণ করা হয়েছে। এ কারণেও মৃত্যু হয়েছে অনেকের। আমরা এই সব মৃত্যুকেও গণহত্যার অন্তর্গত করব। মানুষ পালিয়ে গেছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সহায় সম্পত্তি ফেলে। রাস্তা-ঘাটে মানুষকে হিন্দু না মুসলমান তা পরীক্ষা করা হয়েছে। সর্বত্র একটি আতঙ্কের সৃষ্টি করা হয়েছে। নির্যাতন করার জন্য শুধু ক্যাম্প নয়, আলাদা জায়গাও নির্দিষ্ট করা হতো। এ সব কিছুই নির্যাতনের অন্তর্গত।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ৬ লক্ষেরও বেশি নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সরকার তাদের সম্মান করে 'বীরাঙ্গনা' আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু পরে এই অভিধা সামাজিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কতো মানুষ নির্যাতিত হয়েছে তার হিসাব জানা যাবে না। তবে ১ কোটি নারীপুরুষ শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। শরণার্থী শিবিরে মানবেতর পর্যায়ে তাদের দিন কাটাতে হয়েছে। এটিও নির্যাতনের অন্তর্গত।

বাংলাদেশে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এখানে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনী। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধীনে তারা ছিল বটে তবে মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান, তার মন্ত্রীসভা এবং সামরিক বাহিনীর কমান্ডাররা। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই গণহত্যাকে সমর্থন করেছেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অবাঙালি সবাই এ গণহত্যার ব্যাপারে নিরব থেকে সমর্থন জানিয়েছেন। রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ও আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে জামায়াত-ই-ইসলাম এই গণহত্যায় প্রধান সহযোগীর ভূমিকা রেখেছে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামায়াত-ই-ইসলামী। তারা বিভিন্ন কিলিং স্কোয়াড গড়ে

২৫ মার্চ রাতে ও ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকার বস্তি পাকিস্তানি সৈন্যদের অপারেশন সার্চলাইটের পর, ড্রইং : হাশেম খান, ২০১০

হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষ পালাচ্ছে, ড্রইং : হাশেম খান, ২০১০

তুলেছিল। যেমন আলবদর বাহিনি যার নেতৃত্বে ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘকে সম্পূর্ণভাবে আলবদর বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়। আলী আহসান মুজাহিদ ছিলেন এর উপনেতা। কামারুজ্জামান, কাদের মোল্লা প্রমুখ ছিলেন আলবদর বাহিনীর সংগঠক ও নেতা। ছাত্রসংঘের বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী ও অবাঙালিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল আরেকটি হত্যাকারী বাহিনী আল শামস।

মুসলিম লীগের খাজা খয়েরউদ্দিন, জামায়াতের গোলাম আযম, নেজামী ইসলামের ফরিদ আহমদ প্রমুখের উদ্যোগে সারা বাংলাদেশ জুড়ে সংগঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি। বলা হয়েছিল দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও বজায় রাখার জন্য এ কমিটি করা হয়েছিল। ইউনিয়ন পর্যন্ত এ কমিটি গঠিত হয়েছিল। তবে এর মূল কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজনের খোঁজখবর সেনাবাহিনী বা রাজাকারদের কাছে পৌঁছে দেয়া, পরিত্যক্ত বাড়িঘর লুট করা, সম্পত্তি দখল করা প্রভৃতি। শান্তি কমিটির সদস্যরা এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণহত্যা ও প্রত্যক্ষভাবে নির্যাতনের জন্য দায়ী।

স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, অবাঙালি, রাজনৈতিক কর্মী না হয়েও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল রাজাকার বাহিনি। প্রথমে জামায়াতের এ. কে. এম. ইউসুফ খুলনায় রাজাকার বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে পাকিস্তান সরকারের অধীনে এই বাহিনী সংগঠিত করা হয়। এরাও হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

রাজনৈতিক দল হিসেবে গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামায়াত-ই-ইসলামী, নূরুল আমীনের নেতৃত্বে পিডিপি, ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে নেজামী ইসলামী, ফজলুল কাদের চৌধুরী, খান-এ-সবুর খান প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন প্রণোদনা যুগিয়েছেন।

পরের অনুচ্ছেদগুলিতে গণহত্যা নিয়ে সাম্প্রতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিতর্ক, গণহত্যা ও নির্যাতনের ভয়াবহতা ইত্যাদি বর্ণনা করব। তবে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলতে চাই, পৃথিবীতে

২৬ মার্চ ১৯৭১, ভয়ে পালাচ্ছে ঢাকার মানুষ, ড্রইং : হাশেম খান, ২০১০

ড্রইং : হাশেম খান, ২০১২

১৯৭১, ড্রইং, আমিনুল ইসলাম, ১৯৭১

১৯৭১, ড্রইং, আমিনুল ইসলাম, ১৯৭১
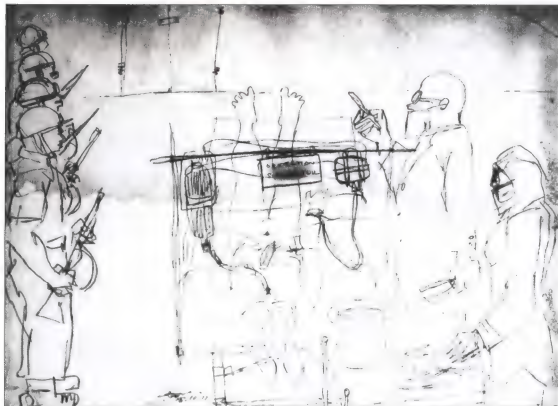
১৯৭১, ড্রইং, আমিনুল ইসলাম, ১৯৭১

এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ আর কখনও কোনো দেশে হত্যা করা হয়নি। এতো কম সময়ে কখনও কোনো দেশে এতো নারী ধর্ষিত হয়নি। এতো নির্যাতন কখনও চালানো হয়নি। এতো মানুষ নির্যাতন হত্যার ভয়ে দেশ ত্যাগ করেনি। আবার যুদ্ধ শেষে নির্ভয়ে সব মানুষ ফিরে আসেনি অনেক দেশে। ইসলামের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত মুসলমান কর্তৃক এতো মুসলমান নিধনের ঘটনা নেই। আর কখনও মুসলমান হত্যায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি একত্রিত হয়নি যেমনটি হয়েছিল ১৯৭১ সালে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও হয়নি দক্ষিণ এশিয়ায়। একমাত্র এই গণহত্যায় এবং এ বিচারের ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছে অধিকাংশ বৃহৎশক্তি ও তথাকথিত ইসলামী শক্তিসমূহ।

২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা ও নির্যাতন [ধর্ষণ]। এতো বড় গণহত্যা হলো, কিন্তু এ গণহত্যা নিয়ে কখনও আলোচনা হয়নি তেমন, বিষয়টি যেন চাপা পড়ে থাকে সে চেষ্টায়ই করা হয়েছে। অথচ কথায় কথায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কার 'হলোকাস্ট'-এর কথা বলি। অবশ্য এ দায় আমাদের ওপরও খানিকটা বর্তায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পগ্রোম বা ভিয়েতনামের মাইলাই নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হয়েছে। বসনিয়া, হারজিগোভিনা, কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা প্রভৃতি দেশের গণহত্যাও ব্যাপক আলোচিত এবং সেই সব আলোচনা ও বিতর্কের ফলে গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে গণনা করা হচ্ছে এবং অপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আদালতও গঠিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে খুব বেশি একটা কেউ আলোচনা করতে চান না। এর কারণ খুঁজতে গেলে ১৯৭১ সালের পরিস্থিতি আলোচনা করতে হবে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি আমেরিকা, চীন, সৌদি আরব ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ। তারা গণহত্যাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। স্বপ্নেও তারা ভাবেনি, লুঙ্গিপরা, থ্রি নট থ্রি সম্বল করে গরিব জীর্ণশীর্ণ মানুষগুলো জিততে পারবে। কিন্তু বাঙালিরা জিতেছিল। এই পরাজয় তাদের আত্মগরিমায় আঘাত হেনেছে। গণহত্যা যেহেতু অপরাধ এবং এ নিয়ে বেশি আলোচনা করলে আমেরিকা, চীন, সৌদি আরবসহ পাকিস্তান সমর্থনকারী দেশগুলোর ওপর গণহত্যার দায় বর্তায়, সে কারণে, গণহত্যা নিয়ে আলোচনা তারা করেনি।

অন্যদিকে, ১৯৭৫ সালে ক্ষমতা দখল করে জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের সেই গণহত্যাকারীদেরই ক্ষমতায় আনেন। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে জিয়া-এরশাদ-খালেদা-নিজামী ২৫ বছরের ওপর প্রায় একাধিক্রমে বাংলাদেশ শাসন করেছেন। গণহত্যা দূরে থাকুক তখন ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

বাংলাদেশে নির্মূল কমিটির নেতৃত্বে যখন যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টি প্রাধান্য পেল জাতীয় রাজনীতিতে তখন গণহত্যা ও এর সঙ্গে সংশিষ্ট নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের বিষয়টি নিয়েও বিতর্ক শুরু হলো। গণহত্যা বিষয়ে বলা হলো, শেখ মুজিবুর রহমান তো ইংরেজি তেমন জানতেন না। ইংরেজিতে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে থ্রি লাখকে থ্রি মিলিয়ন বলে ফেলেছিলেন। সেই থেকে বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে চালু হয়ে গেল ত্রিশ লাখ বা থ্রি মিলিয়ন মারা গেছে। এটি কি সম্ভব! বিএনপি-জামায়াত সমর্থক 'বুদ্ধিজীবী'রা এ বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে উস্কে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর কথায় ত্রিশ লাখ শহীদের কথা চালু হয়নি। ত্রিশ লাখ শহীদের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *প্রাভদায়*। এর পর অস্ট্রেলিয়া বেতার থেকেও খুব সম্ভব একই কথা বলা হয়েছিল। সেই থেকে গণহত্যার ত্রিশ লাখের কথা বলা হয়।

নারী নির্যাতন নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর নাতনি শর্মিলা বসু বিতর্ক ছড়িয়ে দেন। ১৯৭১ সালে ও তার পর পাকিস্তানিরা যা বলতেন, শর্মিলাও একই কথা বলা শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন এবং মস্ত বই লিখে 'প্রমাণ' করার চেষ্টা করলেন যে, বাংলাদেশে মাত্র ৩০০০ নারী ধর্ষিত হয়েছেন। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেই অপমান। আসলে শর্মিলাদের মতো পাকিস্তানি-মনাদের পাঞ্জাবি সৈনিকদের হাতে তুলে দিলে তারা বুঝতে পারত ধর্ষণ কী? ধর্ষণের অপমান আর্তি কী? ধর্ষণের যে সংখ্যা ১৯৭১ সালে বলা হতো এখন তা চার ভাগের এক ভাগে চলে এসেছে।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আক্রান্ত হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে যথাযোগ্য উত্তর দেয়ার লোকের সংখ্যাও কমে গেছে। এ ছাড়া আমাদের মানসিকতায় বীরত্ব বড় ব্যাপার। গণহত্যা, নির্যাতন, লাঞ্ছনা নয়। সে কারণে বলব, বাংলাদেশের গণহত্যা, নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের যে ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করব। তবে এই মানসিকতার সূত্রপাত নিয়ে প্রথম আলোচনা করা যাক।
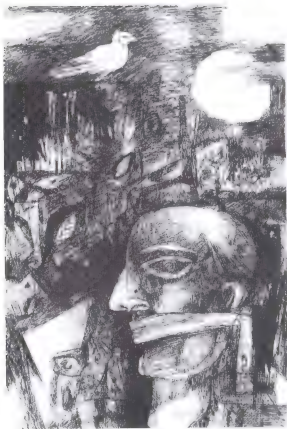
স্মৃতি ১৯৭১, কালি ও কলম, বীরেন সোম, ১৯৯৩

স্মৃতি ১৯৭১, কালি ও কলম, বীরেন সোম, ১৯৯৩

৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ইতোমধ্যে সহস্রাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশই স্মৃতিকথা, দিনলিপি, যুদ্ধের বিবরণ প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের, অহঙ্কারের দিকটি যত আলোচিত হয়েছে সে মাত্রায় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার, নারী নির্যাতন, গণহত্যার দিকগুলো রয়ে গেছে উপেক্ষিত।

আসলে বাঙালি ভালোবাসে বীরত্বগাথা। এর একটি কারণ বোধহয়, ক্ষুদ্র এক ব-দ্বীপে তার বসবাস। মাত্র কিছুদিন হলো বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। সে দেখেছে আশপাশে নির্যাতিত, গরিব, ক্ষুদ্র সব মানুষ! চিন্তার জগতটাই তার ছোট। তাই সাহসী কাউকে দেখলেই সে চমৎকৃত হয়। সে সবসময় বীরের কথা বলতে চায়, যদি সে বীর হয় 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়ে চলিল'-এর মতোও। এ যাবত প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বইপত্র দেখলে এ কথাটি আরও স্পষ্ট হবে। শুধু রণগাথা, বীরত্বের ব্যঞ্জনা। না, নির্যাতন, অত্যাচারের কথা তেমন নেই। এ ইঙ্গিতও নেই কোথাও যে, অত্যাচার ও বীরত্বও এই সূত্রে গাঁথা। মানুষ অত্যাচারিত হয়, নিপীড়িত হয়, বিদ্রোহ করে এবং তার পর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে লড়াই করে। মুক্তিযুদ্ধ কি তাই নয়? পাকিস্তানের কলোনির অধিবাসী হিসেবে বাঙালি অপমানিত, শোষিত হয়েছে, ১৯৭১-এর শুরু থেকে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা রুখে দাঁড়িয়েছে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। লড়াই করেছে বীরের মতো। তাই শুধু বীরত্ব যদি হয় ইতিহাসের গাথা তাহলে পটভূমিকা থাকে অস্পষ্ট, অজানা সেই বীরত্বের ব্যঞ্জনাও হারিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের গাঁথা কি কম রচিত হয়েছে? কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান বা ইতিহাসে? কিন্তু বীরত্বের গাঁথা কতটুকু মনে রেখেছে বাঙালি? মনে রাখলেও রেখেছে খুব অস্পষ্টভাবে। স্পষ্টভাবে রাখলে তো বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী রাজাকার হতো না। 'আলবদর মাওলানা' মান্নান (প্রয়াত) বা গোলাম আযম তো ১৯৭১ সালের পর প্রকাশ্যে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারতেন না। কারণ, এই বীরত্বের পটভূমিকাটি সব সময় স্পষ্ট হয়নি, অনবরত বলা হয়নি এটি নতুন প্রজন্মের কাছে।

স্মৃতি ১৯৭১, কালি ও কলম, বীরেন সোম, ১৯৯৩

স্মৃতি ১৯৭১, কালি ও কলম, বীরেন সোম, ১৯৯৩

তাছাড়া বাঙালির বৈপরিত্যের আরেকটি দিক উল্লেখ্য। বাঙালি আবার কোনো বীরকে বেশি দিন সহ্য করতে পারে না। প্রথম সুযোগে তাকে ধুলায় ফেলে দিতে বাঙালি কার্পণ্য করে না। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব কম জাতিরই আছে। কিন্তু বাঙালি যেহেতু মানুষ এবং মানুষ আর কিছু না হলেও অত্যাচার-অপমানের কথাটা মনে রাখে, বাঙালিরও তাই আর কিছু না হোক অত্যাচারের কথাটা মনে থেকেছে। গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে এ কথাটা টের পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে উপন্যাস, গল্প থেকে কবিতা, প্রবন্ধ থেকে গান– সবখানে কি বার বার ঘুরেফিরে আসে না হিটলারের সেই ক্রুর মুখ আর গুলির শব্দ। ইউরোপের শহরে-বন্দরে কি এখনও চোখে পড়ে না ফ্যাসিস্ট বা নাৎসিদের বীভৎসতার স্মারক? এর কারণ, সেখানে বীরত্বের গাঁথা যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অত্যাচারের গাঁথাও এবং তা বর্ণিত হয়েছে প্রবলভাবে, জোরালোভাবে, যা এখনও মর্মমূল কাঁপিয়ে দেয়। যে কারণে এখনও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নির্মিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অসামান্য সব চলচ্চিত্র। নির্মিত হয় 'গণহত্যা' জাদুঘর। জেনেশুনে ইউরোপ সে কথা মনে রেখেছিল যে, মানুষ সব ভুলতে পারে কিন্তু অত্যাচার-অপমানের কথা ভোলে না।

আমরা আবার অনেক সময় অত্যাচারকে মনে করি অপমান। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক গড়নে এ ধরনের হীনমন্যতা সব সময় ছিল এবং আছে। উদাহরণ দেয়া যাক– একজন শিক্ষককে পাঁচজন ছাত্র এসে পিটিয়ে গেল বা একজন তরুণীকে দু'জন মিলে ধর্ষণ করল, তাতে ঢি-ঢি পড়ে গেল। সমাজ এ সব ঘটনাকে ব্যক্তির অপমান হিসেবে চিহ্নিত করে লুকোতে চায়। ঘটনাটি উল্টো করে দেখি না-কেন? পাঁচজন একজনকে পেটাল, যাকে পেটাল তার অপমান হয় না, বরং ভীরুতা প্রমাণিত হয় পাঁচজনের এবং সেই ভীরুতা হলো অপমান। দু'জন এক তরুণীকে ধর্ষণ করলে তরুণীটি কেন অপমানিত হবে? অপমানিত হবে যারা তাকে রক্ষা করতে পারেনি, অর্থাৎ আশপাশের মানুষ, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ। কারণ, তাদের ভীরুতার কারণেই তরুণীটি ধর্ষিত হয়েছে। অপমানিত হবে সে সব পরিবার, যে সব পরিবারে ধর্ষকরা বড় হয়েছে, কিন্তু মানুষ হয়নি। কারণ, সে সব পরিবার তাদের শেখায়নি সভ্য সমাজে কিভাবে বসবাস করতে হয়।

স্কেচ : ১৯৭১-এর জানোয়ারদের 'সেই সব জের টেনে' কামরুল হাসান, ১৯৭২

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আর অহঙ্কারের ঘটনাপ্রবাহ আমাদের মধ্যে আত্মশ্লাঘার সঞ্চার করে নিশ্চিতভাবে কিন্তু অপমানের বা নির্যাতনের ঘটনার আবেদনও কিছুমাত্র কম নয়। বরং অপমানের ঘটনা জাতির অনুভূতিতে যে গভীর ক্ষত এবং তা যে সংহতি গড়ে তুলতে পারে, তা গৌরবের আনন্দ দিয়ে সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত বা অনালোচিত বিষয়ের উপাত্ত সংগ্রহে মনোনিবেশ করা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের কম আলোচিত দিকগুলোর একটি হচ্ছে গণহত্যা। পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরে শহর থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত অগণিত গণহত্যা চালায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সব গণহত্যার শিকার নিম্নবর্গের মানুষ যাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, তারা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না। ওয়াহিদুল হক 'জাহানারা ইমাম স্মারক' বক্তৃতায় যথার্থই বলেছেন যে, "স্বাধীনতার চেতনার মধ্যে 'গণহত্যার চেতনা' প্রধান, 'গণহত্যাকে, ত্রিশ লাখের বলিকে প্রায় চার লাখ বাঙালি নারীর সম্ভ্রম আহূতিকে ভুলতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কিছুই বাকি থাকে না। মুক্তিযুদ্ধের আদিতে আরম্ভ এই দিনে গড় দশ হাজার বাঙালি নিধনের নিরন্তর মোচ্ছব, একে ভুলিয়ে দিয়েই আরম্ভ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উৎসাধন। ... একমাত্র গণহত্যার চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিকষিত হেমে পরিণত করতে পারে।"
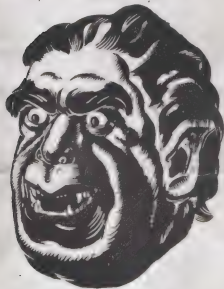
১৯৭১ সালে করা
কামরুল হাসানের সাড়া জাগানো পোস্টার
মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে, ৩০ লক্ষ বাঙালি ও
৬ লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের
প্রধান নেতা রাক্ষসরূপী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান,
বাংলাদেশ সরকার পোস্টারটি প্রকাশ করেছিল

৪

আগেই উল্লেখ করেছি, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। প্রাচীনকাল থেকেই কখনও না কখনও গণহত্যা করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন আমলেও হত্যা সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রেই। কোরআনে, হযরত মুহাম্মদ (স.) বাণীতে একই কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আধুনিককালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার ব্যাপকভাবে আবার গণহত্যা শুরু করেন যাকে 'এথনিক ক্লিনজিং'ও বলা যায়। এ কারণে যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে নাৎসি নেতাদের বিচার হয়েছে এবং সে প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এরপর, বাংলাদেশেই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপকভাবে গণহত্যা চালায়। সাধারণ হিসেবে বলা হয়েছে ত্রিশ লাখ শহীদ হয়েছিলেন মাত্র নয় মাসের এই যুদ্ধে।

গণহত্যার সঙ্গে জড়িত আছে আরও কিছু বিষয়। আমরা সাধারণত বলি ২৫ মার্চ থেকেই গণহত্যা শুরু হয়েছে। আসলে ১ মার্চ থেকে কারফিউ দিয়ে মানুষ হত্যা শুরু হয়। ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ৩০০ জনকে হত্যা করা হয়। এই হত্যা আরও পরিকল্পিত ও সংহত এবং পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার তারিখ ২৫ মার্চ। ২৫ মার্চ রাত থেকে শুরু হয় ধ্বংসলীলা ও গণহত্যা। সমন্তরালে শুরু হয় অপহরণ, গ্রেফতার। সঙ্গে চলে নির্যাতন। গণহত্যার পর লাশ ফেলে রাখা হয় বা ভাসিয়ে দেয়া হয় নদীতে। অনেক ক্ষেত্রে একই কবরে সমাহিত করা হয় একাধিক ব্যক্তিকে যাকে আমরা বলছি গণকবর। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি জায়গা বেছে নেয়া হয় হত্যার জন্য যা পরিচিত বধ্যভূমি হিসেবে। এসব কিছু একই সঙ্গে গ্রথিত।

প্রত্যেক যুদ্ধে নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযুদ্ধও এর ব্যতিক্রম নয়। গণহত্যা ছাড়াও নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়েছে অনেক নারীকে। আমি এখানে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দেব।

১৯৭২ সালের পত্রপত্রিকায় আমি কিছু প্রতিবেদন দেখেছি। এই প্রতিবেদনগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িকতার কারণে। মানুষ তখনও পাক হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগীদের অত্যাচার সম্পর্কে ভুলে যায়নি। ফলে, এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো বিশ্বাসযোগ্য যদিও কোনো কোনো

ক্ষেত্রে তা আবেগাক্রান্ত এবং তা ছিল স্বাভাবিক। ঐ সময় যারা পেরিয়ে আসেনি তাদের পক্ষে এ আবেগ অনুধাবন করা কষ্টকর। অনেক প্রতিবেদনে আঞ্চলিকভাবে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে যার বিবরণ এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিস্মৃতির অতলে তা তলিয়ে গেছে। আমি কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। বিভিন্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জানতে পারি, বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা–

নোয়াখালী ৭১ হাজার, নরসিংদী ৯০%
নওগাঁ ৫০ হাজার, শান্তাহার ৫ হাজার
জামালপুর ৭৮ হাজার, টাঙ্গাইল ২১ হাজার ৩৪৮
বগুড়া ৮০ হাজার

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িটিও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আনরডের (জাতিসংঘ) হিসেবে ছয় হাজার গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাবটি দেখা যাক–

কুমিল্লা ১,৪৬০টি, নওগাঁও ৩০,০০০টি
সাতক্ষীরা ৭৫%, সিরাজগঞ্জ ৮০%

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক স্কুলসমূহের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ লাখ। মোট ৩৪৫৭টি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছিল যার ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৩৫ কোটি।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ পাই তাহলো

বিআইডিসি ১০ কোটি টাকা, ডিআইটি ২ লাখ টাকা
শিল্প প্রতিষ্ঠান ১৫০টি, ইমারত বিভাগ ৩ কোটি টাকা
খুলনার সব কয়টি জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান

এছাড়াও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ- [*আনরডের মতে*]
গবাদি পশু ২২ লাখ
চা বাগান ১২৮, বাস ১০০০টি
সেতু ২৭৪, কৃষিপণ্য ৩৯৪ কোটি টাকা

বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রতিবেদনও ছাপা হয়েছিল। যেমন–
রামগড় ৫ কোটি টাকা, রাজশাহী ৫ কোটি টাকা
ভৈরব শহর ১০০ কোটি টাকা, জামালপুর ১২ কোটি টাকা
ভৈরব বন্দর ৩০০ কোটি টাকা, চালনা বন্দর ১.৫০ কোটি টাকা

আনরডের হিসাব মতে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৯৩০ কোটি। ৪ লাখ শিশু সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল কুমিল্লার ৪০ হাজার জেলে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যখন বলা হয় ৩০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিলেন, আজকাল অনেক বাঙালিই তা মানতে চান না। এ বিষয়েও বিতর্কে মেতে ওঠেন। ১৯৭২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী আঞ্চলিকভাবে আমরা সামান্য যে হিসাব পাই তাতেই বিস্মিত হতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ–

[অঞ্চলভিত্তিক নিহতদের হিসাব]

দিনাজপুর ৭৫,০০০ জন
চাঁদপুর ১০,০০০ জন
বরিশাল শহর ২৫,০০০ জন
ঝালকাঠি ১০,০০০ জন
রংপুর ৬০,০০০ জন
আখাউড়া ২০,০০০ জন
কুষ্টিয়া ৪০,০০০ জন
নওগাঁ ২০,০০০ জন
কুমিল্লা ২০,০০০ জন
নড়াইল ১০,০০০ জন
বগুড়া শহর ২৫,০০০ জন
জামালপুর ১০,০০০ জন

২৬ শে মার্চের সকাল, চারকোল, আব্দুর রাজ্জাক

একাত্তরের স্মৃতি, জলরং, মনসুর উল করিম
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

ঠাকুরগাঁও ৩০,০০০ জন
চট্টগ্রাম ১ লাখের ওপর
সেতাবগঞ্জ ৭,০০০ জন
পার্বতীপুর ১০,০০০ জন
সৈয়দপুর ১০,০০০ জন
কুড়িগ্রাম ১০,০০০ জন
চৌদ্দগ্রাম থানা ১,০০০ জন
স্বরূপকাঠি ও বানারীপাড়া ৫,০০০ জন
মানিকগঞ্জ ১,০০০ জন
নরসিংদী ১,০১৯ জন
হাজীগঞ্জ ৩০,০০০ জন

এছাড়া হরিরামপুরে একটি পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল ১০,০০০ নরমুণ্ডু। কুমিল্লায় ১১ দিনে উদ্ধার করা হয়েছিল ৭,০০০ কঙ্কাল। রাজশাহীর ২টি গ্রামে এক রাতে হত্যা করা হয়েছিল ৫০০, জয়পুরহাটে একদিনে ৫০০-এর বেশি, দিনাজপুরের দুটি গ্রামে ৩,৭০০, শেরপুর জেটিতে ২০০, খুলনার চুকনগরে একদিনে ১০,০০০। যারা খবর আনা-নেয়া করতেন বা কুরিয়ার হিসেবে কাজ করতেন সে রকম ১৫০ জন গিয়েছিলেন বাঘের পেটে। স্বাধীনতার পর হানাদার বাহিনীর পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিল ৬৬ জন। আরও জানা যায়, নিয়াজী মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশে হত্যা করা হয়েছিল ১৫ লাখ মানুষকে।

২৫ মার্চের গণহত্যার বিবরণ উদ্ধৃত করি। উদ্ধৃতিগুলো বড় হবে কিন্তু ইচ্ছে করেই তা সংক্ষেপ করিনি। এ প্রজন্ম এবং আমাদের অনেকেই যেন আবার মনে পড়ে পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা কী করেছিল বাংলাদেশে।

জগন্নাথ হলের কালীরঞ্জন শীল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিলেন জগন্নাথ হলে। গোলাগুলি শুরু হলে তিনি রুম থেকে বেরিয়ে আসেন ও তিনতলায় হলের সহসম্পাদক সুশীলের ঘরে যান। তার ঘর তালাবদ্ধ দেখে উত্তর দিকে বাথরুমের দিকে গেলেন। সেখানে দেখলেন, "উত্তর-বাড়ির সমস্ত আলো নিভানো। মিলিটারি হলে ঢুকে টর্চের আলোতে ছাত্রদের খুঁজে খুঁজে বের করে এনে সামনের মাঠে শহীদ মিনারের কাছে গুলি করে মারছে। এক একটা ব্রাশ ফায়ার করছে আর চিৎকার করে কতকগুলো তাজা প্রাণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। কেউ দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করতেই তাকে সে অবস্থায় গুলি করে মারছে। এখনও ভাবতে পারি না এ দৃশ্য এত

গণহত্যা ১৯৭১, তেলরং: কামরুল হাসান

বাস্তব ও জীবন্ত তবুও মনে হয় স্বপ্ন। মাঝে মাঝে দালানের ওপর ভারি কামানের গোলা বর্ষণ হচ্ছে। কোনো কোনো স্থানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। এক সময় এসেমব্লির সামনে ডাইনিং হলটি জ্বলতে দেখলাম। উত্তর বাড়ির কয়েকটি রুমেও আগুন জ্বলতে দেখা গেল। মাঝে মাঝে উপর থেকে নিচে সবুজ ও লাল রং-এর আলোর গোলা নামতে দেখেছি। তখন চতুর্দিকে আলোকিত হয়ে উঠছিল। আর সেই আলোতে দেখা গেল উত্তর বাড়ির সামনের মাঠে শত শত মিলিটারি মেশিন গান ও ভারি কামানের গোলাগুলি বর্ষণ করছে নির্বিচারে। এক সময় দেখলাম এক একটি গাড়ির বহর হেড লাইট বন্ধ করে থেমে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকে আবার চলে যাচ্ছে। সম্ভবত দেখে নিচ্ছে ঠিক ঠিক গুলি হচ্ছে কিনা, মানুষ মরছে কিনা। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল সলিমুল্লাহ হলের দিক থেকে ৪০/৫০ জন মিলিটারি দক্ষিণ বাড়ির ঘরের দিকে এলো এবং দরজা ভেঙে খাবার ঘরে ঢুকল। খাবার ঘরের আলো জ্বলল এবং এলোপাতাড়ি জানালা কবাটের ওপর গুলি ছুড়তে লাগল। কয়েকজন চিৎকার করে মারা গেল বুঝতে পারলাম। আমি প্রথমে লেট্রিন ও সেখান থেকে জানালা পেরিয়ে তিনতলার কার্নিশে গেলাম ও শুয়ে পড়লাম। সেখানে কয়েকটি শাল গাছ ছিল। একটি মোটা ডাল (শাখা) কার্নিশের কাছে নুয়ে ছিল। একবার ভাবলাম গাছে উঠি। শেষ পর্যন্ত গাছে না উঠে কার্নিশেই শুয়ে থাকলাম। হলের মধ্যে তখন শুধু গুলির শব্দ আর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। একতলা, দোতলা করে এভাবে ওরা তিন তলায় উঠল বুঝলাম। এক সময় আমার কাছেই কয়েকটি গুলির শব্দ হলো। আমার মাথা সোজা দেয়ালের বিপরীত দিকে একটা লোক গোঙাচ্ছে শুনতে পেলাম। আমি তখন ভাবছি কখন আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু আমাকে ওরা দেখেনি বুঝতে পারলাম। বুঝলাম ওরা নেমে গেল। নিচে থেকে 'ফরিদ' বলে ডাক দিল। একজন সৈন্য সাড়া দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল। যেভাবে ছিলাম সেভাবে শুয়ে থাকলাম কিছু সময়। এক সময় কার্নিশ থেকে উঠে এসে আবার লেট্রিনে ঢুকলাম। সেখান থেকে উত্তর বাড়ি, তার সামনের মাঠ ও সলিমুল্লাহ হলের যে অংশ দেখা যাচ্ছিল সেখানে মিলিটারির তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলাম আর কখন এসে আমাকে ধরে নিয়ে গুলি করবে সেই মুহূর্ত গুণতে লাগলাম। এক সময় দেখা গেল সলিমুল্লাহ হলের দিকে আগুন। সলিমুল্লাহ হলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বড় একটি গাছেও আগুন

কালো রাত্রির দিন, ড্রইং, স্বপন চৌধুরী, ১৯৭১

জ্বলতে দেখলাম। মাঝে মাঝে উত্তর বাড়ির পশ্চিম দিকের আকাশ লাল হয়ে উঠছিল আর বুঝতে পারছিলাম ঐ দিকের কোথাও আগুন লাগিয়েছে পাক সেনারা। এক সময় আযানের শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকদিকে আযান শোনা গেল। মনে হলো আযানের এমন করুণ সুর– এত বিষণ্ন সুর আর কোনোদিন শুনিনি। গোলাগুলির শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু মুহূর্তের জন্য মাত্র। আবার চলল গোলাগুলি পুরোদমে। ভোরের দিকে মাইকে কারফিউ জারির ঘোষণা শুনলাম। তখন ভাবলাম বেলা হলে বোধ হয় এমন নির্বিচারে আর মারবে না। কিন্তু একটু ফর্সা হয়ে যেতেই দেখা গেল এখানে সেখানে পালিয়ে থাকা ছাত্রদের ধরে এনে গুলি করছে। যেন দেখতে না পায় আমাকে এভাবেই মাথা নিচু করে লেট্রিনের মধ্যে বসে রইলাম।

বেলা হলো। এক সময় আমার কাছাকাছি বারান্দায় অনেকের কথা শুনতে পেলাম। ছাত্ররা কথা বলছে তা নিশ্চিত হয়ে আমি লেট্রিনের দরজা খুলে বেরুলাম। বেরিয়েই দেখি সিঁড়ির মাথায় মেশিনগান তাক করে মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকজন ছাত্র একটি লাশ ধরাধরি করে নামাবার চেষ্টা করছে। রাতে আমার মাথার কাছে দেয়ালের ওপাশে যে গোঙাগাচ্ছিল এটা তারই লাশ। এবং সে আর কেউ নয়, আমাদের হলের দারোয়ান সবার প্রিয় প্রিয়নাথ দা। তাঁকে দিয়ে মেশিনগানের মুখে সব পথ দেখে নিয়ে নামার মুহূর্তে এখানে গুলি করে রেখে গেছে। আমিও আর নিষ্কৃতি পেলাম না।

আমাকে ধরতে হয় লাশ। তিন তলা থেকে দোতলা, সেখান থেকে একতলা এবং একতলার দক্ষিণ দিকের ভাঙা গেট দিয়ে ব্যাংকের (এখন যেটা সুধীরের কেন্টিন; ওটা ছিল ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান) উত্তর পাশে নিয়ে রাখলাম। আরো লাশ জড়ো করা হলো সেখানে। ওখানে আমাদের বসার নির্দেশ দিল একজন পাক সেনা।

তখন ছিলাম আমরা কয়েকজন ছাত্র, কয়েকজন মালী, লন্ড্রির কয়েকজন, দারোয়ান গয়ানাথের দুই ছেলে– শংকর ও তার বড় ভাই আর সবাই ছিল সুইপার। লাশগুলোর পাশ ঘিরে আমরা সবাই বসেছিলাম। সুইপারগুলো ওদের ভাষায় মিলিটারিদের কাছে অনুরোধ করছিল ওদের

বাংলাদেশ ১৯৭১, কালি ও কলম, মুর্তজা বশীর
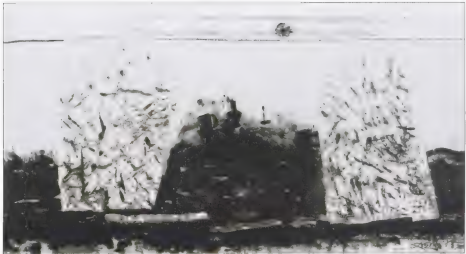
বধ্যভূমি, কালো রং ড্রইং, সৈয়দ জাহাঙ্গীর

ছেড়ে দেবার জন্য। বলছিল ওরা বাঙালি নয়। সুতরাং ওদের কি দোষ? একজন মিলিটারি ওদের আলাদা হয়ে বসতে বলল। আমাদের কাছ থেকে ওদের নিয়ে কয়েকজন মিলিটারি সোজা উত্তর বাড়ির মাঠে চলে গেল। ভাবলাম ওদের ছেড়ে দেবে। আমাদের আবার লাশগুলো বহন করতে আদেশ দিল। লাশগুলো নিয়ে এসেমব্লির সামনের রাস্তা দিয়ে সোজা পূর্ব দিকে গেটের বাইরে চলে গেলাম। গেটের বাইরে দক্ষিণ পাশে একটি বড় গাছের গোড়ায় জড়ো করলাম লাশগুলো। এই সময় আমাদের সঙ্গে প্রায় সমান সংখ্যক মিলিটারি ছিল। এবং তারা সবাই ছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ওখানে গিয়ে মিলিটারিরা দাঁড়াল অনেকক্ষণ। একজন সিগারেট বের করে দিল সবাইকে। আমাদের কেউ বসে, কেউ শুয়ে থাকল। আমিও কাত হয়ে ছিলাম গাছের শিকড়ের ওপর। এইখানে পাক সেনারা আমাদের উদ্দেশে বিশ্রী ও অকথ্য ভাষায় ক্রমাগত গালাগালি করছিল। যতটা বুঝতে পারছিলাম তাতে বুঝলাম, [তারা বলছে] শালা বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেব, বল একবার শালার জয় বাংলা, শেখ মুজিবর্কে[সহ] বাংলাদেশ স্বাধীন করিয়ে দেব। আরও নানা অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছিল। এ সময় গাড়ির বহর রেসকোর্সের দিক থেকে এসে ওখানে থামল। আমাদের সঙ্গের মিলিটারির একজন সামনের একটি জিপের কাছে গেল। তাকে কিছু নির্দেশ দেয়া হলো। সেখান থেকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে নিয়ে গেল লাশ বয়ে আনতে। আমাদের অংশটিকে নিয়ে গেল ড. গুহ ঠাকুরতা যে কোয়ার্টারে থাকতেন সেই দিকে। সেই বিল্ডিংয়ের সিঁড়ির কাছে অনেক লাশ পড়েছিল, সিঁড়ির কাছে এনে গুলি করেছে বোঝা গেল। একটি লাশ দেখলাম সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, মাথায় টুপি, পাতলা চেহারা। সেখান থেকে নিয়ে গেল দোতলা, তিনতলা ও চারতলায় লাশ বয়ে আনতে। প্রতিটি তলায় ওরা খোঁজ নিচ্ছিল কোনো জীবিত প্রাণী আছে কি না। আর খুঁজছিল দামী মালামাল, ঘড়ি সোনা-দানা ইত্যাদি। চারতলায় একটি রুমে ঢুকতে পারছিল না কারণ রুমের দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। দরজা ওরা ভেঙে ফেলল। ঢুকে কাউকে পাওয়া গেল না। কতকগুলো এলোমেলো কাপড় চোপড়, বিছানাপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না সেখানে। একজনকে ছাদে উঠে কালো ও স্বাধীন বাংলার পতাকা নামাতে বলল। পতাকা নামিয়ে আনলে মিলিটারিদের একজন নিয়ে এলো সেগুলো। আমাদের নিচে

নামতে বলল। নিচে নামলাম আমরা। সিঁড়ির কাছে লাশগুলো নিতে বলল। অনেক লাশ রাস্তায় আগেই জমা করা ছিল। বয়ে আনা লাশগুলোও জড়ো করলাম। ঐ বিল্ডিংয়ের সামনের দোতলা বাংলো বাড়িটিতে (তখনকার এসএম হলের প্রভোস্টের বাড়ি) সামনে দিয়ে ঢুকতে না পেরে পেছন দিয়ে ঢুকলাম বাড়িতে। নিচতলার সব রুমেই খুঁজলাম। এলোমেলো কাপড় চোপড় স্যুটকেস, বাক্স, খোলা ফ্যান ছাড়া কিছুই দেখা গেল না সেখানে। মিলিটারিরা দামী জিনিসপত্র খুঁজে খুঁজে নিয়ে নিল। কোনো লাশ কিংবা রক্তের দাগ ছিল না। ঐ দালানে নেমে আসলাম আমরা সবাই এবং জড়ো হলাম আবার লাশের কাছে। মিলিটারিরা কালো পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা পোড়াল।

আমাদের আবার লাশ নিতে বলল। রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তর দিকে অধ্যাপক গোবিন্দ দেবের বাসার সম্মুখ দিয়ে ইউওটিসি বিল্ডিংয়ের সামনে জগন্নাথ হলের মাঠের পূর্ব দিকের ভাঙা দেয়াল দিয়ে ঢুকতে বলল। হলের মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে শহীদ মিনারের সংলগ্ন লাশগুলোর কাছে জড়ো করতে লাগলাম লাশগুলো। লাশ যখন নিচ্ছিলাম তখন দেখলাম ড. দেবের বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসছে সেলাইর মেশিন ও অন্যান্য ছোটখাটো মালপত্র। রাস্তার পাশে অনেক মিলিটারি ট্রাক যুদ্ধের বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিববাড়ীর রাস্তার তিনমাথায় অনেক মর্টার চতুর্দিকে তাক করে রেখেছিল।

দু'জন তিনজন করে আমরা এক একটা লাশ বহন করছিলাম। কোনো জায়গায় বসলে কিংবা ধীরে ধীরে হাঁটলে গুলি করার জন্য তেড়ে আসছিল। সব সময়ই আমরা সবাই গা ঘেঁষে বসছিলাম ও চলছিলাম।

কতগুলো লাশ এভাবে বহন করছি ঠিক মনে নেই। শেষ যে লাশটা টেনেছিলাম তা ছিল দারোয়ান সুনীলের। তার শরীর তখনও গরম ছিল। অবশ্য রৌদ্রে থাকার জন্যও হতে পারে। লাশ নিয়ে মাঠের মাঝামাঝি যেতেই হঠাৎ কতগুলো মেয়েলোক চিৎকার করে উঠল। দেখি মাঠের দক্ষিণ দিকের বস্তিটির মেয়ে ছেলেরা মাঠের দিকে আসতে চাচ্ছে আর পাক সেনারা

মেশিনগান নিয়ে ওদের তাড়াচ্ছে। সামনে চেয়ে দেখি সুইপারদের মাঠে এনে দাঁড় করিয়েছে গুলি করার জন্য। এই সুইপারদেরকেই ব্যাংকের কাছে আমাদের থেকে আলাদা করে এই মাঠে নিয়ে এসেছিল ওরা।

সুইপারদের গুলি করে মারছে আর ওই মেয়েছেলেরা চিৎকার করছে এবং ছুটে যেতে চাচ্ছে ওদিকে। বুঝলাম এবার আমাদের পালা। আমাদের আগে যারা লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল তাদেরও দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে জোরে শব্দ করে কোরানের আয়াত পড়ছিল। ব্যাংকের কাছে যখন বসেছিলাম তখন জেনেছি এই ছেলেটি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। কিশোরগঞ্জে ছিল তার বাড়ি। আগের দিন বিকালে আর এক বন্ধুসহ এসে উঠেছিল তার হলের এক বন্ধুর রুমে। গুলি করল তাদের সবাইকে। আমরা কোনো রকমে দুজনে লাশটা টানতে টানতে নিয়ে এসেছি। সামনেই দেখি ড. গোবিন্দ দেবের মৃতদেহ। ধুতিপরা, খালি গা। ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত সারা শরীর। পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে যে ছেলেটি লাশ টানছিল সে গোবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বলল, দেবকেও মেরেছে। তবে আমাদের আর মরতে ভয় কি? কি ভেবে, আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশসহ শুয়ে পরলাম। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা তখন আমার ছিল না। চোখ বুজে পড়ে গেলে ভাবছিলাম এই বুঝি লাথি মেরে তুলে গুলি করবে। এক সময় ভাবছিলাম তবে কি আমাকে গুলি করছে, আমার তখন কোনো অনুভূতি নেই। কি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। এই মরার মতো অবস্থায় কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারি না। এক সময় আমার মাথার কাছে ছেলেমেয়েদের ও বাচ্চাদের কান্না শুনতে পেলাম। চোখ খুলে দেখি সুইপার, দারোয়ান ও মহিলাদের বাচ্চারা ও মেয়েছেলেগুলো মৃত স্বামী কিংবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে। তখনও অনেকে মরেনি। কেউ পানি চাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ পানি খাওয়াচ্ছে এই সময় দেখলাম এক একজন গুলি খেয়েও হামাগুড়ি দিয়ে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মাথা তুলে দেখি যেদিকে মিলিটারির গাড়ি ও অসংখ্য মিলিটারি ছিল সেদিকে কোনো গাড়ি বা মিলিটারি নেই। চতুর্দিকে একনজর দেখে নিয়ে মেয়েছেলে ও বাচ্চাদের মধ্যে দিয়ে নুয়ে নুয়ে বস্তির মধ্যে গেলাম। প্রথমে গিয়ে ঢুকি চিৎকালীর ঘরে। চিৎকালী ঘরে ছিল না। এক

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১২

১৯৭১, ড্রইং : ধীরাজ চৌধুরী, ১৯৭১

পাশবিক অত্যাচার, কাগজে জলরং, ড্রইং : স্বপন চৌধুরী, ১৯৭১

মহিলা ভয়ে কাঁপছিল। তার কাছে পানি খেতে চাইলে সে একটি ঘটি দেখিয়ে দিল। পানি খেয়ে ওর ঘরের কোণে যে খাট ছিল তার নিচে লুকিয়ে থাকতে চাইলাম। মহিলাটি আমাকে তক্ষুণি সরে যেতে বলল। তখন আমি বস্তির পাশের লেট্রিনে ঢুকে পড়ি।"

এবার ঐ সময়ের বিদেশী সংবাদপত্রের কিছু ভাষ্য উদ্ধৃত করছি। ১৯৭২ সালে ফজলুর রহমানের *বাংলাদেশের গণহত্যা* শীর্ষক বইয়ে উদ্ধৃতিগুলো অনুবাদ করা হয়েছিল।

"... কোনো সন্দেহ নেই যে, এক্ষেত্রে 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। এটা হচ্ছে একটা মারাত্মক রক্তপাত। সৈন্যরা ছিল নিষ্ঠুর পাষণ্ড-পাশ্চাত্যের এক কর্মচারী মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন-এটা চেঙ্গিস খানের মতো কার্যকলাপ।" [*লা এক্সপ্রেস*, ১২ থেকে ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১]

"একজন ইউরোপীয় প্রত্যাগমনকারী বলেন, 'প্রত্যেক রাতে আমি ভারি মেশিনগান ও মর্টারের আওয়াজ শুনতাম। সেখানে পানি, বিদ্যুৎ কিছুই ছিল না। সৈন্যরা বাঙালিদের পিছনে পিছনে ছুটত এবং যাদের ধরতে পারত তাদের ট্যাঙ্কের পেছনে এমনভাবে বাঁধত যাতে তাদের মাথাগুলো মাটিতে আছড়াতে থাকে।" [*টাইম*, ৩ মে, ১৯৭১]

"সবচেয়ে বর্বরতম হত্যা সংঘটিত হয় শহরের পুরনো এলাকায়। সেখানে অনেক জায়গা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। সৈন্যরা প্রত্যেক মহল্লার চারদিকে গ্যাসোলিন ছড়িয়ে দেয় এবং হাউই ছুড়ে সেগুলো জ্বালিয়ে দেয়; তারপর আগুনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে যে সমস্ত লোক পালাতে চেষ্টা করেছিল তাদের কচুকাটা করা হয়।

একজন বিদেশী শুনতে পান সৈন্যরা চেঁচিয়ে বলছে, 'ওরা বেরিয়ে আসছে, মারো হারামজাদাদের।'

খুব কম লোকই এই ধ্বংসলীলার হাত হতে রক্ষা পায়। পুরনো ঢাকা ২৫টি মহল্লায় ছড়িয়ে আছে যারা বেঁচে যায় তাদের ভয় দেখাবার জন্য সৈন্যরা তিনদিন পর্যন্ত গলিত লাশগুলো সরাতে অস্বীকার করে; অথচ ইসলাম ধর্মে রুহকে মুক্ত করার জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃতদেহ দাফন করার নির্দেশ রয়েছে।

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১২

ঘর-বাড়ি খানা-তল্লাশি করার সময় একজন যুবক সৈন্যদের তার সতেরো বছর বয়স্ক তরুণী বোনটিকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। ফলে সৈন্যরা তার চোখের সামনে তার বোনকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন ডাক্তার কর্নেল আবদুল হাইকে তার পরিবারের কাছে শেষবারের মতো একবার ফোন করার সুযোগ দেয়া হয়। আর তার এক ঘণ্টা পরই বাড়িতে তার লাশ পাঠানো হয়।

যে বুড়ো লোকটি কারফিউ উপেক্ষা করে জুমার নামাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল তাকে মসজিদে ঢোকার পথে গুলি করে মারা হয়।" [*স্টেটম্যান*, ১৩ মে, ১৯৭১]

'শকুনগুলো বেশি খাওয়ায় উড়তে না পেরে গঙ্গার তীরে ভয়াবহ তৃপ্তিতে বসে আছে। মার্চ মাস থেকে পাঁচ লাখেরও বেশি নিহত পাকিস্তানিদের তারা খাদ্য হিসেবে পেয়েছে।

চট্টগ্রামে যাওয়ার পথের দুধারে বাঙালি-অধ্যুষিত পুরো এলাকার ঘর-বাড়ি, দোকানপাট ভেঙে চুরে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়।" [*সানডে টাইমস্*, ২০ জুন, ১৯৭১]

"কার্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিসেনাদের পরাজিত করার জন্য ঢাকায় অবস্থিত সামরিক শাসকগোষ্ঠী একটি দ্বি-মাত্রিক সাঁড়াশি নীতি উদ্ভাবন করে। প্রথমত, সমস্ত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পপতিদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। দ্বিতীয়ত, যদি কাউকে প্রচ্ছন্নভাবে বিপজ্জনক মনে করা হয় তবে তাকে সরিয়ে ফেলা হয়। ইতোমধ্যেই সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ, শিক্ষক, সাংবাদিক ও অন্যান্য প্রভাবশালী বাঙালিদের গ্রেফতার ও জেরা করতে শুরু করেছে। যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অথবা এর সমর্থক সেইসব সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সাদা, ধূসর ও কালো। সাদাদের ছেড়ে দেয়া হবে। ধূসর তালিকাভুক্ত লোকদের চাকরি যাবে কিংবা হয়ত জেলও হতে পারে, আর কালো তালিকাভুক্তদের গুলি করে মারা হবে।

সরকারি চাকুরেদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ৩৬ জন জেলা শাসক ও মহকুমা অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে ..."

গণহত্যা পর্ব শেষ করব চুকনগর গণহত্যা দিয়ে। ২৩ মে, ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই গণহত্যা চালিয়েছিল। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার একটি গ্রাম চুকনগর। এর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভদ্রা নদী। খুলনার বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা শুরু হলে, চারপাশের হিন্দুরা সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য চুকনগরে এসে জমা হতে থাকে। এদিক থেকে সীমান্ত পাড়ি দেয়া ছিল সহজ। ১৮ মে থেকে ২০ মের মধ্যে প্রচুর লোক এসে জমা হন চুকনগর। এলাকাটি হয়ে ওঠে একটি ট্রানজিট ক্যাম্প।

২০ মে পাকিস্তানি সৈন্যদের কনভয় এসে থামে চুকনগরে। ঘিরে ফেলে চুকনগর এবং তারপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। মানুষ পালাবার পথ পায়নি। ভদ্রা নদীতে নৌকায় ছিলেন অনেকে। তারাও রেহাই পাননি। অপারেশন চলে চার থেকে পাঁচঘণ্টা। গুলিতে যারা মারা যাননি তাদের বেয়নেট খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। সৈন্যরা চলে গেলে স্থানীয়রাই লাশ ফেলছিলেন নদীতে। তাদের একজন আমায় বলেছিলেন, বিয়াল্লিশটি লাশ গোনার পর তিনি আর গোনেননি। ভদ্রা নদীতে লাশ ভেসে গেছে কচুরিপানার মতো। চুকনগর কলেজের ভিত্তি গাড়ার সময়ও হাড়গোড় পাওয়া গেছে অনেক।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রশান্ত রায়ের বয়স ছিল তখন মাত্র ৭ বছর। বাবাকে নিয়ে সে লুকিয়েছিল পুকুরে ডুব দিয়ে। পানি থেকে মাথা তুললেই সৈন্যরা গুলি করে। প্রশান্তের বাবা পানির নিচে আর থাকতে না পেরে মাথা তুলতেই পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে মাথা চৌচির হয়ে যায়। প্রশান্ত বলে, হঠাৎ দেখি পানির নিচে বাবা আমার হাত ছেড়ে দিয়েছেন। পানিও লাল হয়ে গেছে। অনেকে বাচ্চা নিয়ে পানিতে নেমেছিলেন। বাচ্চারা যাতে চিৎকার না করে সে জন্য বাচ্চা সহ ডুব দিয়েছিলেন। এভাবেও অনেক শিশু মারা যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইন্সটিটিউট থেকে আমার সহকর্মীদের নিয়ে চুকনগরে একটি মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প করেছিলাম। সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী প্রায় ১৫০ জনের সাক্ষাৎকার নিই। তার ওপর ভিত্তি করে ২০০২ সালে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *১৯৭১ : চুকনগরে গণহত্যা*। সেখানে চুকনগরের গণহত্যার বিশদ বিবরণ আছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ঐ দিন প্রায় ১০,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয় চুকনগরে।

৫

পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগী রাজাকার-আলবদর বাহিনী বাঙালিদের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে তার প্রচুর বিবরণ থাকা উচিত ছিল যাতে ভবিষ্যতে নাগরিকরা বুঝতে পারে বাংলাদেশবিরোধীরা কী রকম প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে রকম প্রচুর বিবরণ নেই। কিছু খণ্ডচিত্র পাওয়া যাবে শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, মন্টু খানের *হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন*, রশীদ হায়দার সম্পাদিত *একাত্তরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা* এবং আতোয়ার রহমান সম্পাদিত *একাত্তরের কড়চায়*। শাহরিয়ার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় অত্যাচারের একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে লিখেছেন– তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; দলিলপত্রের* ১৬ খণ্ডের মাত্র একখণ্ড (১৯৭৭) 'গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা' নিয়ে। এরপর যেসব বিবরণ বেরিয়েছে তার অধিকাংশের সূত্র এই অষ্টম খণ্ড যদিও পরবর্তী প্রায় বিবরণে এই সূত্রের উল্লেখ নেই।

"নির্বিচার গণহত্যার ভেতরে ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রাধিকারেরও একটি বিষয় ছিল। পাকিস্তানিরা তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল– ১. আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের, ২. কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের, ৩. মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীদের, ৪. নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে এবং ৫. ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের।"

তবে সব সময় যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছিল, তা নয়। প্রথমদিকে এবং পরেও নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। তারপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাড়ি থেকে তুলে এনে হত্যা করা হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি হত্যার আগে নির্যাতনের কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তবে সামান্য। শাহরিয়ার নির্যাতনের বিভিন্ন বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর চিহ্নিত মাধ্যমগুলো হলো–

"নির্যাতনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যরা গ্রহণ করত তা হচ্ছে– ১. অশ্লীল ভাষায় গালাগাল, তৎসঙ্গে চামড়া ফেটে রক্ত না বেরুনো

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১২

পর্যন্ত শারীরিক প্রহার, ২. পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, তৎসঙ্গে বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো ও রাইফেলের বাট দিয়ে প্রহার, ৩. উলঙ্গ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা, ৪. সিগারেটের আগুন দিয়ে সারা শরীরে ছ্যাঁকা দেয়া, ৫. হাত ও পায়ের নখ ও মাথার ভেতর মোটা সুঁচ ঢুকিয়ে দেয়া, ৬. মলদ্বারে ভেতর সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁকা দেয়া এবং বরফখণ্ড ঢুকিয়ে দেয়া, ৭. চিমটে দিয়ে হাত ও পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, ৮. দড়িতে পা বেঁধে ঝুলিয়ে মাথা গরম পানিতে বার বার ডোবানো, ৯. হাত-পা বেঁধে বস্তায় পুরে উত্তপ্ত রোদে ফেলে রাখা, ১০. রক্তাক্ত ক্ষতে লবণ ও মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া, ১১. নগ্ন ক্ষতবিক্ষত শরীর বরফের স্ল্যাবের ওপর ফেলে রাখা, ১২. মলদ্বারে লোহার রড ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক শক দেয়া, ১৩. পানি চাইলে মুখে প্রস্রাব করে দেয়া, ১৪. অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন চোখের ওপর চড়া আলোর বাল্ব জ্বেলে ঘুমোতে না দেয়া, ১৫. শরীরের স্পর্শকাতর অংশে বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ প্রভৃতি।"

ইয়াহিয়া খান, ড্রইং, কামরুল হাসান

১৯৭১. ধীরাজ চৌধুরী, ১৯৭১

ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের ভয়াবহতা বোঝা যায় একটি বিবরণে। ২৫ মার্চ গণহত্যার পর লাশ সরাবার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সুইপারদের ধরে আনা হয়। এরকম একজন ছিলেন ছোটন ডোম। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি তথ্য সংগ্রহকারীদের কাছে যা ছাপা হয়েছিল হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *স্বাধীনতার দলিলপত্রে*। ছোটন বলেছিলেন–

"২৯ মার্চ সকালে আমি ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সাথে শাঁখারী বাজারে যেতে বলা হয়। জজ কোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাক সেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাঁখারী বাজারে প্রবেশ করতে পারি নাই। পাটুয়াটুলি ঘুরে আমরা শাঁখারী বাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাঁখারী বাজারের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে আমরা শাঁখারী বাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম– দেখলাম মানুষের লাশ, নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বালক, বালিকা, কিশোর, শিশুর বীভৎস পঁচা লাশ। চারদিকে ইমারতসমূহ ভেঙে পড়ে আছে। মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম। দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবি সেনারা পাষণ্ডের মতো লাফাতে লাফাতে গুলিবর্ষণ করছিল। বিহারী জনতা শাঁখারী বাজারের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনা-দানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলার জন্য সেদিন আর শাঁখারী বাজারের প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০ মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে বলা হয়।

"আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা দেখলাম। প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে দশ জন পনের জনের লাশ বের করলাম। সব যুবক ছেলে ও স্বাস্থ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম।

রাজাকারের নৃত্য, কাগজে জলরং, স্বপন চৌধুরী, ১৯৭১

প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমণ্ডল কালো দেখলাম, এসিডে জ্বলে বিকৃত ও বিকট হয়ে আছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষধের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোনো দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেটন ও বেয়নেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারও মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, কারও হৃৎপিণ্ড বের হয়ে আছে। নদীর পাড়ে ছয়জন রূপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষতবিক্ষত, উলঙ্গ লাশ দেখলাম। চোখ বাঁধা, হাত, পা শক্ত করে বাঁধা প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা, মুখমণ্ডল, বক্ষ ও যোনিপথ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

'এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যামবাজার, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদীর ঘাট থেকে পঁচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালীবাড়ি লাশ তুলেছি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে স্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিম দিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে আমি লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি পুরুষ ও শিশু সমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিঁড়ির সামনে লেপের ভিতর পেচানো জনৈক অধ্যাপকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।"

যশোহরের আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন মশিহুর রহমান। ১৯৭০ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। হানাদার বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে এবং তারপর নৃশংস নির্যাতন করে হত্যা করে। ১৯৭২ সালে *দৈনিক বাংলার* একটি প্রতিবেদনে সে সম্পর্কে লেখা হয়–

"বর্বরতা কতটা চরম রূপ ধারণ করলে হত্যা করা যেতে পারে শিশুর মতো নিষ্পাপ, ঋষির মতো সরল এবং সংসার সম্পর্কে উদাসীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক বৃদ্ধ দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেবকে– পাকিস্তানিরা তা প্রদর্শন করেছে '৭১-এ। '৭০-এর নির্বাচনে
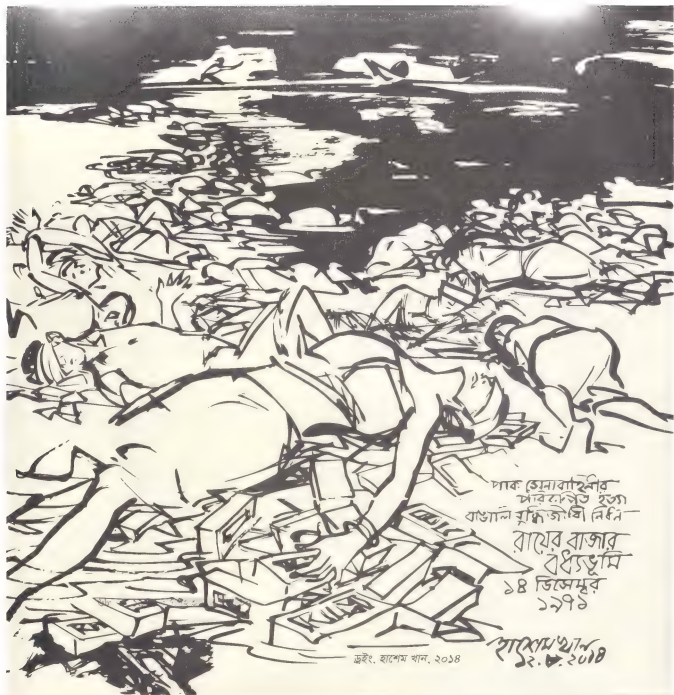
ড্রইং. হাশেম খান, ২০১৪

জয়ী পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সদস্য আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা মশিহুর রহমানকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কী নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে তার বিবরণ '৭২-এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। *দৈনিক বাংলার* প্রতিবেদনে বলা হয়েছে–

"ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে পাক হানাদার বাহিনী তিল তিল করে তাঁকে সংহার করেছে। ... এই ঘৃণিত পশুর দল প্রথমে তাকে নীতিচ্যুত করার জন্য নানা ধরনের অত্যাচার চালায়। শরীরের নানা স্থানে আগুনে পোড়ানো, দেহকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে তাতে লবণ মাখান থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত লাগান হয়েছে। অত্যাচারে যখন তাঁর বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল তখনও তাঁর মনের বলিষ্ঠতা একটুও কমেনি। সব সময় তিনি একই কথা বলেছেন, 'আমি আমার জনগণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে পারব না।"

"সত্যিই তিনি তা পারেননি। হানাদার বাহিনী যখন তাঁর বাম হাত কেটে ফেলে ডান হাতে লেখার জন্য হুকুম চালায় তখন যন্ত্রণায় শুধু কেঁপেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ ঠোঁট দুটো একটুও কাঁপেনি। প্রতিদিনে একে একে হানাদার পশুরা যখন তাঁর দুই পা, দুই হাত কেটে বিকলাঙ্গ দেহের পরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তখনও একটু কেঁপে ওঠেনি তাঁর দৃঢ়ভাবে বন্ধ ঠোঁট দুটো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে ফিরে যখন এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর শুনেছেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।"

প্রায় প্রতিটি এলাকায় ছিল নির্যাতন কেন্দ্র। আলবদর, রাজাকার, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ছাড়াও দখল করা বিভিন্ন বাসগৃহ/অফিস/কারখানা ব্যবহৃত হতো নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে। এরকম একটি নির্যাতন কেন্দ্র ছিল লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরি। ঘাতকরা বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে রেলস্টেশনে অপেক্ষমান নারী-পুরুষকে এই সিগারেট ফ্যাক্টরিতে এনে নির্যাতন চালাতো ও নারীদের ধর্ষণ করতো। ডা. এম. এ. হাসান লিখেছেন– হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা "পরিকল্পিতভাবে মেয়েদের ভয়ঙ্কর নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে আমাদের

২৮.০৩.২০১২
১৯৭১. পাক হানাদার বাহিনীর বাঙ্কারের ভেতর
জয় বাংলার মেয়েদের 'ন্যুড' প্রদর্শনী।
ঘরে ঘরে হানা দিয়ে রাজাকার বাহিনী ধরে এনেছে মেয়েদের-

অহঙ্কারকে পদদলিত করার অভিপ্রায়ে অনেক মহিলা যাত্রী ও গ্রাম থেকে ছিনিয়ে আনা পল্লীবালা ও কুলবধূদের এখানে এনে উলঙ্গ করে কারখানার রেলিং বিহীন ছাদে উঠিয়ে দুহাত উপরে তুলে সারাদিন হাঁটতে বাধ্য করতো। এই নির্যাতনে যে সমস্ত মেয়ে মৃত্যুবরণ করতেন অথবা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন তাদের মরদেহ কারখানার বিভিন্ন কোণায় পুঁতে ফেলা হতো।"

পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর আলবদররা কী ধরনের অত্যাচার করতো তারও বিবরণ খানিকটা পাওয়া গেছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরে ঢাকার রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে গিয়েছিলেন লেখিকা হামিদা রহমান। লিখেছেন তিনি–

"আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা। ... আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা। ... মেয়েটি সেলিনা পারভীন। *শিলালিপির* এডিটর। ... মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোককে যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।"

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেছিলেন, "হানাদার পাক বাহিনীর সহযোগী আলবদররা পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পর যখন পালিয়ে যায় তখন তাদের হেডকোয়ার্টারে পাওয়া গেল এক বস্তা বোঝাই চোখ। এ দেশের মানুষের চোখ, আলবদরদের খুনীরা তাদের হত্যা করে চোখ তুলে বস্তা বোঝাই করে রেখেছিল।" [*দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৯.১.১৯৭২] উল্লেখ্য, প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরীর চোখ আলবদররা উৎপাটন করেছিল।

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১২

সব যুদ্ধে নারীই হয় প্রথম বলি। মুক্তিযুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় নারীকে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়েছে। হাটে-ঘাটে বাটে যেখানে যখন খুশি যাকে তাকে তুলে নিয়েছে পাকিস্তানি বাহিনী বা তাদের দোসররা।

১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের আলমদার রাজা ছিলেন ঢাকার কমিশনার। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা না করায় তাকে ফেরত নেয়া হয় এবং সে থেকে তিনি সিভিল সার্ভিসে আর কোনো ভালো পোস্টিং পাননি। যুদ্ধশেষে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে তিনি হাইকোর্টে একটি রিট করেছিলেন। ১৯৯৯ সালে ইসলামাবাদে আমি তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। তিনি বলছিলেন, আদালতে রিট পেশের সময় "আমি বলছিলাম একটি ঘটনার কথা। চার সৈনিক হামলা করেছে এক বাসায়। বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কন্যাটি তরুণী। সে হাতজোড় করে তাদের জানাল যে, সে মুসলমান, তাকে যেন তারা বোনের মতো দেখে। তারপরও তারা যখন এগিয়ে আসছে তখন সে বলল, আমিও তো পাকিস্তানি। তোমাদের কারও হয়ত আমার মতো মেয়েও আছে। তাও তারা মানল না। যখন সে বিছানার পাশে কোরান শরীফ রেখে বলল, আমার যদি কিছু করতে চাও তাহলে এই কোরান ডিঙিয়ে করতে হবে। তারা কোরান শরীফ ডিঙিয়েছিল। আমি যখন আদালতে এ বর্ণনা দিচ্ছি তখন সারা আদালত স্তব্ধ। আর বিচারক আমাকে জিজ্ঞেস করছেন বারবার। আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি? আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি? তার চোখে পানি।"

নারীদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা তেমন পাওয়া যায়নি। সেটি স্বাভাবিক। তবে, মুক্তিযুদ্ধের *দলিলপত্র*, আমার লেখা *বীরাঙ্গনা '৭১* বা নীলিমা ইব্রাহীমের *বীরাঙ্গনা* এসব নির্যাতনের কিছুটা বিবরণ সংকলিত হয়েছে। *স্বাধীনতার দলিলপত্র* থেকে এরকম একটি বিবরণ সংকলন করছি–

"রাবেয়া খাতুন নামে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এক সুইপার এ রকম একটি বিবরণ দিয়েছেন। তাঁকে ২৬ মার্চই হানাদার সেনারা খুঁজে পায় এবং ধর্ষণ শুরু করে। পুলিশ লাইনের

ড্রইং. হাশেম খান. ২০১২

ময়লা পরিষ্কার না হতে পারে বিধায় তাকে আর প্রাণে মারা হয়নি। তিনি বলেছেন, এরপর শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিশোরী, তরুণী, মহিলাদের দলে দলে ধরে আনা হতে লাগল পুলিশ লাইনে এবং এর পরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙালি নারীদের ওপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবি সেনারা কুকুরের মতো জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। ... উন্মত্ত পাঞ্জাবি সেনারা এই নিরীহ বাঙালি মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই– আমি দেখলাম পাক সেনারা সেই মেয়েদের ওপর পাগলের মতো উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারালো দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়ে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্যত ও উন্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

যে সকল বাঙালি যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করল দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবি সেনারা ওদেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছোঁ মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দু পা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম। পাঞ্জাবিরা, শ্মশানের লাশ– যে কোনো কুকুরের মতো [শ্মশানের লাশ কুকুররা যেভাবে টানাটানি করে পাঞ্জাবিরাও] মদ খেয়ে সব সময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধরে ধর্ষণ করছিল।

শুধু সাধারণ পাঞ্জাবি সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নাই, সকল উচ্চপদস্থ পাঞ্জাবি সামরিক অফিসারই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মতো হয়ে দুই হাত বাঘের মতো

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১২

নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙালি মহিলাদের ওপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ কাজে লিপ্ত থাকত। কোনো মেয়ে, মহিলা যুবতীকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেয়া হয় নাই, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, পরের দিন এ সকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়ের সম্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এ সকল মহিলা-বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্য মেয়েরা আরো ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করত।

যে সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের হাসি-তামাশায় দেহ দান করছে তাদেরকেও ছাড়া হয় নাই। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়ের ওপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এরপর উলঙ্গ মেয়েদের গরুর মতো লাথি মারতে মারতে, পশুর মতো পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টার দোতলা, তৃতীয় ও চারতলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবি সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদের লাথি মেরে আবার কামরার ভেতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে চলে যেত। এরপর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দায় মোটা লোহার তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রতিদিন পাঞ্জাবিরা সেখানে যাতায়াত করত। সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস ব্যাটন দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকত, কেউ তাদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ উপভোগ করত, কেউ ধারালো চাকু দিয়ে কোনো যুবতীর পাছার মাংস আস্তে আস্তে কেটে আনন্দ করত, কেউ উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে

ড্রইং. হাশেম খান. ২০১২

উন্মুক্ত বক্ষ মেয়েদের স্তনে মুখ লাগিয়ে ধারালো দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করত।

কোনো মেয়ে এসব অত্যাচারে কোনো প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো। প্রতিটি মেয়ের হাত বাঁধা ছিল পিছনের দিকে, শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবি সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত মেয়েদের এলোপাথাড়ি বেদম প্রহার করে যেত।

প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারও মুখের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দুদিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙুল, হাতের তালু ভেঙে, থেঁতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মহিলা ও মেয়েদের প্রস্রাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেয়া হতো না এক মুহূর্তের জন্য। হেডকোয়ার্টারের উপর তলার বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করত– আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করতাম।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙালি যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবি সেনাদের নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলায়ও সেখানে সেই সকল বন্দি মহিলার পূতিগন্ধ প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসের উপরতলা হতে বহু ধর্ষিত মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙালি যুবতীদের সারাক্ষণ সশস্ত্র পাঞ্জাবি সেনারা প্রহরা দিত। কোনো

বাঙালিকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোনো সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না।"

নীলিমা ইব্রাহিমের *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*তে বেশ ক'জনের সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এরকম কয়েকটি সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্তসার সংকলন করছি–

"আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোনো ক্যাম্পে নাকি কোনো মেয়ে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা যাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠত।

"... পরদিন হঠাৎ একটি মেয়ে মারা যায়। অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সকাল থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ওরা বন্ধ দরজায় অনেক চেঁচামেচি করল। কেউ এল না। ... মেয়েটার নাম ছিল ময়না। বছর পনের বয়স হবে। কাটা পাঁঠার মতো হাত পা ছুড়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল, মুখখানা নীল হয়ে গেল। বয়স্কা সুফিয়ার মা একটা ছোট কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল কারণ, ঘরে ওরা চাদর দেয় না। সন্ধ্যার পর ওরা লাশটা নিয়ে গেল।"

যৌথ কমান্ড যখন এককেটি এলাকা থেকে হটিয়ে দিচ্ছিল পাকিস্তানিদের তখন তারা একটি বাঙ্কার থেকে চিৎকার শুনে সেদিকে এগিয়ে যায়। সেখানে ছিল শেফা নামে একটি মেয়ে। তাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে এনেছিল। তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন নীলিমা ইব্রাহীম-

"হঠাৎ অনেক লোকের আনাগোনা, চেঁচামেচি কানে এল। একজন বাঙ্কারের মুখে উঁকি দিয়ে চিৎকার করল, কোই হ্যায়; ইধার আও। মনে হল আমরা এক সঙ্গে কেঁদে উঠলাম। ঐ ভাষাটা আমাদের নতুন করে আতঙ্কগ্রস্ত করল। এরপর কয়েকজনের মিলিত কণ্ঠ, এবারে মা আপনারা বাইরে আসুন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা আপনাদের নিতে এসেছি। চিরকালের

সাহসী আমি উঠলাম। কিন্তু এত লোকের সামনে আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দৌড়ে আবার বাঙ্কারে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ প্রথম আওয়াজ দিয়েছিল, 'কোই হ্যায়', সেই বিশাল পুরুষ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে নিজের মাথার পাগড়ীটা খুলে আমাকে যতটুকু সম্ভব আবৃত করলেন। ভেতরে দাঁড়িয়ে আরও ছয়জন আছে বলায় আশপাশ থেকে কিছু লুঙ্গি, শার্ট জোগাড় করে ওরা একে একে বেরিয়ে এল এবং ওদের কোনো রকমে ঢাকা হল। আমি ওই শিখ অধিনায়ককে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠলাম। ভদ্রলোক আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'রো মাৎ মায়ি।'

এরপর শেফা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন। বিয়ের পর তার প্রথম সন্তানের নাম শ্বশুর রেখেছিলেন আরমান। কিন্তু শেফা ওকে ডাকেন 'যোগী' বলে।

কেউ জানে না এ নামের পরিচয়। শুধু শেফা এ নামটা তার হৃদয়ে রক্ত দিয়ে লিখে রেখেছে। শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে শেফা সেদিন একজন দেবদূত প্রত্যক্ষ করেছিল, তার নাম যোগীন্দর সিং, যে তার পবিত্র শিরস্ত্রাণ খুলে শেফার অপবিত্র দেহটাকে ঢেকে দিয়েছিল আর কয়েকবার তাকে মাতৃ সম্বোধন করেছিল। তাই শেফা মনে মনে যোগীন্দরকে তার প্রথম সন্তান ভাবে। আরমানকে যোগী ডেকে তাকে চুমুতে ভরিয়ে দেয়। মনে মনে বলে, আল্লাহ যেন তেমনই সারা জীবন মায়ের সম্মানের হেফাজত করে।"

নারী, নির্যাতিত নারী সব সময় বাংলাদেশে অবমাননার শিকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি প্রহর কেটেছে তাদের আতঙ্কে, যারা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের ভাগ্য তখনই নির্ধারিত হয়েছে। অনেকে বলেন, বঙ্গবন্ধু তাদের 'বীরাঙ্গনা' অভিধায় ভূষিত করেছেন। আসলে তা নয়। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার আগেই তৎকালীন নারী নেত্রীরা এই নির্যাতিতদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তারা চেয়েছিলেন নির্যাতিতরাও যেন মুক্তিযোদ্ধার সম্মান পান। সে জন্য নির্যাতিতদের তারা এবং সরকার অভিধা দিয়েছিল বীরাঙ্গনা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেও নির্যাতিতদের স্থান হয়নি।

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১২

ট্র্যাজেডি এখানেই। আমরা নাকি 'মা-বোন'দের ইজ্জত করি'। বস্তুত এ ধরনের ভণ্ডামি খুব কম সমাজেই আছে। বঙ্গবন্ধু তাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসন করতে চেয়েছিলেন, করেছিলেনও। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এ সব পুনর্বাসন প্রকল্প বন্ধ করে দেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা অনেকের চেষ্টার পরও দেখা গেল সমাজ বীরাঙ্গনাদের গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করছে। প্রিয়ভাষিণীর স্বামী আহসানউল্লাহর সংখ্যা দু-একজনের বেশি নয় যিনি প্রকাশ্যে গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আছি। তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন'। অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমনকি পিতামাতাও। নীলিমা ইব্রাহিমের বইতে তার বিবরণ আছে। নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা ছিল কেমন? এ সংখ্যা কখনও নির্দিষ্ট করা যায়নি, করা সম্ভবও নয়। আর আমরা যে সংখ্যাই বলি তাই চ্যালেঞ্জ করা হয়, এ দেশেও। তাই আমি "*বাংলার বাণী*তে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এক অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তারের প্রতিবেদনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তাঁর নাম ডা. জিওফ্রে ডেভিস। ঐ সময় সিডনি থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি নির্যাতিত নারীদের সেবা প্রদানের জন্য। তাঁর মতে, মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা চার লাখের কম নয় এবং সেই হিসাবের তিনি একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন– "ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের হিসাব মতে ধর্ষিত মহিলাদের আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিসের মতে এই সংখ্যা অনেক কম করে অনুমান করা হয়েছে। তিনি মনে করেন, এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে হতে পারে। ডা. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ-কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ...

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১২

ধর্ষিতা মহিলাদের যে হিসাব সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারী হিসাব করেছেন। সারাদেশের ৪৮০টি থানা, ২৭০টি পাক সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্করূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু হানাদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাব রক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীদের অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে।"

বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহীম। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নামে দুখণ্ডে এ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর বিবরণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের নারী নির্যাতনের অনেক বিবরণ আছে।

শাহরিয়ার কবির এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, বীরাঙ্গনাদের যে তালিকা ছিল স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তা বিনিষ্ট করে ফেলার জন্য বলেছিলেন। কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হলেও সমাজের মৌল কোনো পরিবর্তন হয়নি। সমাজ এদের গ্রহণ করবে না।

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর নির্মূল কমিটি কয়েকজন বীরাঙ্গনাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য এবং যুদ্ধাপরাধ এ মাটিতে কী পর্যায়ে হয়েছিল তার সাক্ষ্য হিসেবে। সেই মহিলারা এতদিন স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার পর সমাজপতি ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ তাঁদের প্রায় পরিত্যাগ করে। খুলনায়, আমি একজন মহিলাকে পাগলিনী বেশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি যিনি '৭১ সালে নির্যাতিত হয়েছিলেন খুলনার অনেকেই তা জানেন, তার নাম ছিল গুরুদাসী। কিন্তু কেউ তার পুনর্বাসনে এগিয়ে আসেননি। এই হচ্ছে বাংলাদেশ ও বাঙালির আসল রূপ।

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১২

৭

১৯৭১ সালে পুরো বাংলাদেশই ছিল বধ্যভূমি আর গণকবর। আগেই উল্লেখ করেছি এ পর্যন্ত প্রায় ১০০০ বধ্যভূমি/গণকবর চিহ্নিত হয়েছে। এখনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে বা মাটি খুঁড়লে গণকবরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। জাতি হিসেবে আমাদের ব্যর্থতা হলো– সময় থাকতে আমরা এগুলির খোঁজখবর করিনি। যেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলি সংরক্ষণ করিনি। ১৯৭২ সালের সংবাদপত্র খুঁজলে বধ্যভূমির অনেক সংবাদ জানা যাবে। যেমন–

"চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এলাকা সমেত জেলার আরো নয়টি থানাতে হানাদার খান সেনারা সর্বমোট ২০টি বধ্যভূমিতে বাঙালি নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠান চালিয়েছে ... আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সারা চট্টগ্রাম জেলাতে তিন লাখ বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন বধ্যভূমিতে আজো বহু নরকঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। শহরে ওয়ারলেস কলোনি, ঝাউতলা ও নাছিরাবাদের পাহাড়ী এলাকাগুলোতে লুক্কায়িত বহু নরকঙ্কালের অস্তিত্ব আজো পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ঝাইতলা এলাকার বিভিন্ন সেপটি ট্যাঙ্ক পাহাড়ী ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনেক কঙ্কাল দেখতে পেয়েছি। সীতাকুণ্ডের শিবনাথ পাহাড়ে কয়েক হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। মিরশ্বরাইয়ের জোরারগঞ্জ এবং ওয়ারলেস এলাকার মানুষ জবেহ করার স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। রাস্তায় বাস ট্রাক এবং ট্রেন থেকে হাজার হাজার লোক ধরে এনে আটক করে রাখা হত এবং প্রতিদিন ৫০ জন অথবা ১০০ জন করে হত্যা করা হত।" [*পূর্বদেশ*, ১৩.২.১৯৭২]

"পার্বতীপুরে আরো একটি কঙ্কাল ও লাশের স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে পাঁচশ কবর আছে। বাসস প্রতিনিধি জানাচ্ছে পার্বতীপুর স্টেশনের পাশে বহুসংখ্যক কবর খোঁড়া হয়েছিলো। এই সমস্ত গণসমাধি থেকে একশত কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে এবং স্টেশনের চারপাশের কবরগুলোতে অনেক নির্যাতিতা মহিলার মৃতদেহও আছে বলে অনেকে মনে করছেন।" [*সংবাদ*, ২৫.৩.১৯৭২]

ড্রইং, বীরেন সোম, ২০০৭

বা

"বর্বর দখলদার বাহিনীর নৃশংসতার নজীর উদঘাটিত হয়েছে পাবনায়, ওয়াপদার পাওয়ার অফিস প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে বহু কবর খুঁড়ে হাজার হাজার নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে।

এই অফিসটিকে পাক বাহিনী তাদের সদর দফতর হিসেবেও ব্যবহার করত। আশেপাশের এলাকা থেকে বাঙালিদের ধরে এনে চালানো হত নানা ধরনের নির্যাতন। তারপর হত্যা এবং তারপর মাটি চাপা দিয়ে রাখতো তাদের।" [*দৈনিক বাংলা*, ৮-২-১৯৭২]

আনিসুর রহমান ঢাকার মিরপুরে শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি দেখে এসে লিখেছিলেন, "ইতিহাসে পৈশাচিকভাবে হত্যার অনেক কাহিনী পড়েছি। কিন্তু, শিয়ালবাড়িতে ওই পিশাচরা যা করেছে এমন নির্মমতার কথা কি কেউ পড়েছেন বা দেখেছেন? কসাইখানায় কসাইকে দেখেছি জীবজন্তুর গোস্তকে কিমা করে দিতে। আর শিয়ালবাড়িতে গিয়ে দেখলাম কিমা করা হয়েছে মানুষের হাড়। একটা মানুষকে দু'টুকরো করলেই যথেষ্ট পাশবিকতা হয়, কিন্তু তাকে কিমা করার মধ্যে কোন পাশবিকতার উল্লাস? ... সারা এলাকার মানুষের হাড় ছাড়া অবিমিশ্র মাটি কোথায়?" [*দৈনিক পূর্বদেশ*, ৮.১.১৯৭২]

স্মৃতি, ১৯৭১, কালি ও কলম, বীরেন সোম, ১৯৯৩

স্মৃতি, ১৯৭১, কালি ও কলম, বীরেন সোম, ১৯৮৮

মুক্তিযুদ্ধ আলোচনায় গণহত্যার পরই আন্তর্জাতিক মাধ্যমে স্থান করে নিয়েছিলেন শরণার্থীরা। শরণার্থীদের অবস্থা নিয়ে নানা বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাই এখানে বিশদ আলোচনা করলাম না। তবে, সামগ্রিক পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য একটি মাত্র বিবরণ উদ্ধৃতি করছি। বিবরণটি অঞ্জলি লাহিড়ীর।

মেঘালয়ে শরণার্থী শিবিরে তিনি কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশ সরকার তাকে মুক্তিযুদ্ধে সম্মাননা দিয়েছিলেন।

অঞ্জলি লাহিড়ী সেলা, বাঁশতলা, দোয়ারা বাজার, মাইলাম, টেংরিটিলা পালের শরণার্থী শিবির ও ক্যাম্পে কাজ করেছেন। তাঁর বইয়ে সেই সব স্মৃতির কিছু অংশ বিধৃত হয়েছে-

"লম্বা ব্যারাকের ফাটা বাঁশের ভেতর দিয়ে গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ্দুর ঘরের ভেতরটা তাতিয়ে তুলেছে। দম যেন বেরিয়ে আসার যোগাড়। মাচার এককোণে গোটা তিন ছোট ছোটা শিশু। (ওদের নাতি, নাতনি) একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে। গত এক মাসের ওপর থেকে ওরা আমাশয়ে কাহিল, হাড্ডি জিরজিরে শরীর। ক্যাম্পের চতুর্দিকে কলেরা আর আমাশয়। পুরো ঘরটা মাছিতে ছেঁকে ধরেছে। বাচ্চাগুলোর চোখ-মুখ মাছিতে ঢাকা। বেড়ার ওপাশে একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তারাও তারস্বরে চিৎকার করে বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। সবাই পেটের ব্যথায় ভুগছে। চারদিকে প্রচণ্ড শব্দ, মানুষের কাতরানি আর কান্নার আওয়াজ। এই দুস্থ রোগজীর্ণ মানুষগুলো যেন একদলা আবর্জনার মতোই অর্থহীন। এরা কি সেই একই মানুষ, যারা কোনোদিন শিল্পকলা সৃষ্টি করতো, গান গাইতো, লোকনৃত্যের নানা ভঙ্গিমায় জীবনটাকে সরস করে তুলতো! কোন্ অশুভ শক্তির পাপ স্পর্শে মানুষ আজ মানুষের অপভ্রংশে পরিণত হয়েছে!

মাসিমার পাশের ব্যারাকের একটিতে থাকে এক মুচি পরিবার, অন্যটিতে এক মেথর পরিবার। তাদের প্রতিটি খুপরিতে দশ বারোটি করে বাচ্চা। সবাই যেন কমপিটিশন দিয়ে চিৎকার করে চলেছে।

ড্রইং. হাশেম খান, ২০১২

ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবাই আজ মিলেমিশে একাকার। এই বিপর্যয়ের দিনে মানুষে মানুষে যে মিলন ঘটলো এটা কি স্থায়ী রূপ নেবে?

মাসিমার সঙ্গে আরেকটি খুপরিতে গিয়ে চমকে উঠলাম। ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বসে আছে। দুতিনটে ছেঁড়া গেঞ্জি যোগাড় করে তালি লাগিয়ে একটা আচ্ছাদন তৈরি করার চেষ্টা। আমাকে দেখেই গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই প্রথম কথা, 'দিদি একটা শাড়ি দেবেন?' মাথায় জট পড়ে গেছে, শরীরের রুক্ষ চামড়া যেন ফেটে পড়বে। লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললো, 'দুসপ্তাহ স্নান করিনি, পরনে শাড়ি নেই, নদীতে যাই কেমন করে, লজ্জা করে।'

হঠাৎ পা দুটো জড়িয়ে ধরে আমার। ঘর গেরস্থালির দিকে তাকানো যায় না, যেন এক আঁস্তাকুড়।"

শরণার্থী শিবিরে যখন মহামারী দেখা দিয়েছিল তখনও সেবা করে গেছেন অঞ্জলি লাহিড়ী। সে রকম একটা বর্ণনা-

"রাকেশ বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি। এখনো শিরদাঁড়া কেমন খাড়া করে রেখেছেন। এ রকম মৃত্যুহীন প্রাণ দু'চারটি না থাকলে কারা মূঢ় মূক মুখে ভাষা যোগাবে? প্রাপ্য অধিকারের জন্য দাবি জানাবে?

ওঁকে সঙ্গে নিয়ে চললাম ছাউনি থেকে ছাউনিতে। সেদিন সকালের মধ্যে দুশো লোক কলেরায় মারা গেছে। মহামারী দেখা দিয়েছে মাইলামে। স্যালাইন নেই, রেডক্রস যে ডাক্তার পাঠিয়েছে তা সমুদ্রে বিন্দুবৎ। ওরা হিমশিম খাচ্ছে। একটা ছাউনিতে ঢুকে দেখি এক সৌম্য চেহারার বৃদ্ধ এক বদনা জল নিয়ে মাটিতে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছেন। জিগ্যেস করতে বললেন, আল্লাহ আমারে না লইয়া এই সব কচি ছাওয়ালগুলারে নেয় ক্যান? কাল বৌ গেছে, বড় পুলা দুটা, নাতি-নাতনি গেছে।' আঙুল দিয়ে দেখালেন, 'ঐ যে বড় নাতনি আমিনা, আজথনে তারও দাস্ত বমি।'

দেখি বাঁশের চাঙের উপর শুয়ে আছে এক পরমা সুন্দরী কিশোরী। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে অজানুলম্বিত এক মাথা ঘন কালো চুল। টিকলো নাকে একটি সাদা পাথরের নাকছাবি আলো

একাত্তরে বাংলাদেশ, কালি ও কলম, আমিনুল ইসলাম, ১৯৭১

পড়ে চকচক করছে। আয়ত ডাগর দুখানি চোখ। আমাকে দেখেই দুহাতে জড়িয়ে ধরলে, 'মাসিমা আমারে বাঁচান। আমি মরতে চাই না'। দুচোখের সেই করুণ আকুতি আমার স্মৃতিপটে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু না, স্যালাইন ছিল না। তাকে বাঁচাতে পারিনি। তা ডাগর দুখানি চোখ বোধহয় শেষ পর্যন্ত শকুনেই খুবলে খেয়েছিল।

বাতাসে গন্ধ। মহামারীর গন্ধ। ক্ষুধার গন্ধ, অনিঃশেষ বেদনার জমাট বাঁধা নোনা চোখের জলের গন্ধ। অজস্র বুকফাটা কান্নার নাগপাশ থেকে কানে আঙুল চেপে পালাতে চাইলাম।

'রাকেশ বাবু অনেক হয়েছে আজকের মতো। আর পারছি না।' উনি একটু অনুকম্পার হাসি হাসলেন।

'দিদি এত রাত্তিরে তো শিলং ফিরে যেতে পারবেন না। সারাদিন পেটেও কিছু পড়েনি। খালি পেটে কলেরা রোগীর মধ্যে ঘোরা ঠিক না। ক্যাম্পের সব ছেলেগুলোর চোখ উঠেছে। সমানে জল পড়ে আর অসহ্য ব্যথা। এখানকার লোকেরা এই রোগের নাম দিয়েছে 'জয় বাংলা'। রাকেশ বাবু হাসলেন।"

যুদ্ধ, তেলরং, মাহমুদুল হক
সংগ্রহ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

সবশেষে আমি গণহত্যা ও নির্যাতন নিয়ে যে বিতর্ক তা আলোচনা করব। এই রচনার শুরুতে এ বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করেছি। গত শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যার বিষয়টি আড়ালে ঢেকে দেয়া হলো বড় শক্তিগুলির অপরাধবোধ ঢাকার জন্য।

গণহত্যার বিষয়টি আবার সামনে এসেছে ২০০৯ সাল থেকে। আওয়ামী লীগ জোট ক্ষমতায় এলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ওঠে। সরকার যেহেতু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা সহজ হয়েছিল।

আশা করা হয়েছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সারা দেশে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু হয়নি। জামায়াত ইসলাম, বিএনপিসহ সমমনা দলগুলি নানাভাবে যুদ্ধাপরাধ বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকে। জামায়াত ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত্তি যেহেতু সুদৃঢ় সেহেতু তারা বিদেশে বিচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লবিস্ট আইনজীবী নিয়োগ করে। ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা কঠিন জেনেও তারা এর বিরুদ্ধে প্রচার চালায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। নূরেমবার্গ, টোকিয়ো বিচার নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকায় কেউ এখনও আপত্তি করে না। হলোকাস্ট নিয়ে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয় না বরং বিভিন্ন দেশে হলোকাস্ট জাদুঘর গড়ে তোলা হয়। আপত্তি শুধু বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিচার নিয়ে। অর্থের এমনই জোর। তা ছাড়া পৃথিবীর একমাত্র আইনী সন্ত্রাসী সংস্থা পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী আইএসআইও তৎপর ছিল।

সুভাষচন্দ্র বসুর নাতনী এবং তার দেখাদেখি অনেক গবেষক অন্তর্জালে প্রশ্ন তোলেন প্রথম ধর্ষিতার সংখ্যা নিয়ে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান লেখিকাকে প্রভূতভাবে সহায়তা করেছে আইএসআই। এরপর গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তারপর পাকিস্তান পার্লামেন্টে যুদ্ধাপরাধ বিচারের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে। এসব নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। সবাই

বধ্যভূমি, ক্যানভাসে তেলরং, হামিদুর রহমান, ১৯৮৪
সংগ্রহ, চারুকলা ফ্যাকাল্টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সব বিষয়ে একমত হবেন তা আশা করা যায় না। আমিও এই বিতর্কে অংশ নিতাম না। কিন্তু নিতে হচ্ছে যখন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন ত্রিশ লক্ষ শহীদ নিয়ে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগবিরোধী প্রগতিশীল বলে পরিচিত এক নেতার জামাতা হঠাৎ গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন দেশি বিদেশি প্রচার মাধ্যমে। ইনি বিদেশী, নাম ডেভিড বার্গম্যান, ঢাকার একটি ইরেজি দৈনিকে সাংবাদিকতা করেন। এই ডেভিড বার্গম্যানই একযুগ আগে বৃটেনের চ্যানেল ফোর-এর জন্য বাংলাদেশি যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে চমৎকার একটি ডকুমেন্টারি করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে গণহত্যা ও নির্যাতনের বিষয়টিকে ইচ্ছে করে গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে অন্যায্য বলে তুলে ধরা যায় এবং পাকিস্তানিদের অপরাধ হ্রাস পায়। এসবই আবার পাকিস্তানি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

বিতর্কের ধারণাটি কেমন হয় তা স্পষ্ট করার জন্য ভারতের *দি হিন্দু*-তে বার্গম্যানের প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেব। বার্গম্যান বিশাল কোনো ব্যক্তিত্ব নন। সাধারণ সাংবাদিক। লবিস্টরা সাধারণত এ ধরনের ব্যক্তিদের দিয়ে প্রথমে বিতর্ক শুরু করায়। বার্গম্যান বলেছেন- বাংলাদেশে সরকার সব সময় বলে আসছে পাকিস্তানি ও তার সহযোগীরা ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে এটি কি ঠিক? [তার ভাষায় এটি কি 'ফেয়ার এস্টিমেট'?]

এটিই মূল বক্তব্য এবং তারপর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা 'তথ্য প্রমাণ' হাজির করেছেন। তার মতে, স্বাধীনতার ৪০ বছর পেরিয়ে গেলেও বিষয়টি এখনও স্পর্শকাতর। এ স্পর্শকারতার কারণ, জন্ম থেকেই একটি শিশু এ কথা শুনছে স্কুলে এটি পড়ানো হয়। দেশের কবিতা-সংস্কৃতির বুননে তা ঢুকে গেছে। সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্ন করা গভীর বিশ্বাসকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা।

ডেভিডের মতে, যিনি এ কথা প্রথম বলেছেন, তিনি এদেশের স্বাধীনতার নেতা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। এ সংখ্যাটি বেশি বলে আওয়ামী লীগের নেতা ও সমর্থকরা।

ডেভিড লিখেছেন, ১৯৭১ সাল নিয়ে রক্ষণশীল যে জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে তা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অবস্থানের অংশ বা বিরোধী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিপরীত। এমনকি, তার মতে এ সংখ্যা নিয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে অনেক আওয়ামী লীগার তাকে স্বাধীনতাবিরোধী বা 'অপজিশনাল মাইন্ডসেট' বলে আখ্যা দেবে।

সুতরাং বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ মৃত-কে নিয়ে প্রশ্ন করবে তার মাথা নিচু করে থাকতে হবে, ভীত থাকতে হবে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তিগত আক্রমণের আশঙ্কায়।

ডেভিড বার্গম্যান ও যারা এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এটি ঠিক, আমাদের হৃদয় এবং ১৯৭১ সালের পর যাদের জন্ম তাদের মাথায় ৩০ লক্ষ শহীদ শব্দটি গেঁথে গেছে। কিন্তু, এতে অস্বাভাবিক কী আছে? ডেভিডও নিশ্চয় বড় হয়েছেন 'হলোকাস্ট শব্দটি শুনে। হলোকাস্ট বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার কর্তৃক ইহুদী ও নাজি বিরোধীদের নিধন হলো হলোকাস্ট। এটি বিশ্ববাসী বা ইউরোপীয়দের মধ্যে বিশ্বাস যে, ৩ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন হলোকাস্টে। নাজি বা ফ্যাসিবিরোধী ডিসকোর্সের তা অন্তর্গত এবং ইউরোপের যে-কোনো রাজনৈতিক দল হলোকাস্টের কথা বললে কি মনে হয় যে তা অর্থোডক্স ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্সের অংশ বা কোন দলের বিশ্বাস? হ্যাঁ, হলোকাস্টে মৃতের সংখ্যা নিয়েও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু যারা এ প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা কি মেইনস্ট্রিম এ্যাকাডেমিকসে জায়গা পেয়েছেন? এবং জার্মানিতে, যে জার্মান সরকার এক সময় এ নিধন চালিয়েছে, সে জার্মানিতে কেউ এ প্রশ্ন করলে কি তাকে জার্মান সমাজ গ্রহণ করবে? তাকে কি নাজি সমর্থক মনে করবে না? সে মনে করাটি কি 'অপজিশনাল মাইন্ডসেট'? আমেরিকাতে ইহুদী বিদ্বেষী দু'একজন লেখক এ নিয়ে কথা তুলেছেন এবং খোদ আমেরিকাতে তাদের নিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে গেছে, হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে তাদের 'পাণ্ডিত্য' নিয়ে। তারা পরিশীলিত তাই এ ধরনের ব্যক্তিদের রিভিশনিস্ট বলেছেন। আমাদের দেশের মানুষজন অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, অতটা পরিশীলিত নয়, তাই যারা ৩০ লক্ষকে অস্বীকার করে তাদের যা বলা হয় তা না হয় নাই লিখলাম।

তার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে, আমাদের বিশ্বাস এখনও অটুট। ডেভিড কেন, আমাদের সবাইর একটি বিষয় মনে রাখা উচিত, এ বিচারটা আওয়ামী লীগ না করলে তাদের অনেক নেতাকর্মী হয়তো খুশি হতেন। আওয়ামী লীগ সব সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়েছে কিন্তু প্রথম আমলে তা করেনি। ২০০৮ সালে তারা জনগণের ম্যান্ডেট চেয়েছে বিচারের এবং তা পেয়েছে। তারপরেও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিচার কাজ শুরু হয়নি। পরে সেই ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগ কার্যকর করছে মাত্র। এটি দলীয় কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকরের মতো নয়।

নিবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে ডেভিড বলছেন, সাংবাদিক বা গবেষকদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে 'আইকনিক ফিগার' পর্যালোচনা করবেন। ডেভিড বুদ্ধিমান, পরের লাইনে লিখেছেন, এই পর্যালোচনা পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীদের নিষ্ঠুরতা কম করে দেখানোর জন্য নয়। তার ভাষায়, "This is not in order to minimise the extent of atrocities committed by the Pakistan military and its collaborators which were undoubtedly very significant, but for the purposes of a more accurate representation of history that is not thrall to partisan interest". শেষ বাক্যটি লক্ষ্য করুন, ইতিহাসের স্বার্থে এবং যা পক্ষপাতমূলক স্বার্থের পক্ষে [পড়ুন আওয়ামী লীগ] যাবে না। অর্থাৎ ৩০ লক্ষ নিয়ে প্রশ্ন ওঠালেই তা আওয়ামী লীগের স্বার্থের বাইরে যাবে। এ ধরনের বাক্য গঠন দেখেই বোঝা যায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই লেখাটি রচিত হয়েছে– সেটি হচ্ছে অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া সুষ্ঠু নয়, অভিযোগগুলো বিশেষ করে হত্যার সুষ্ঠু নয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

৩০ লক্ষ শহীদের ব্যাপারটি কীভাবে এলো তারপর তা ব্যাখ্যা করেছেন ডেভিড। ১৯৭২ সালে ১৮ জানুয়ারি ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন- "3 million people have been killed, including children, women, intellectuals, peasants, workers, students..." ফ্রস্ট তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সংখ্যাটি যে ৩ মিলিয়ন তিনি তা কীভাবে বুঝলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি ফেরার আগেই আমার আগেই আমার লোকজন

তথ্য সংগ্রহ করেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবরাখবর আসছে, এখনও সঠিক সংখ্যায় উপনীত হইনি তবে তা কিন্তু ৩ মিলিয়েনের নিচে হবে না।" এর আগে ১০ জানুয়ারিও তিনি একই সংখ্যার কথা বলেছিলেন।

এরপর ডেভিড এ প্রসঙ্গে কট্টর মুজিব ও আওয়ামী লীগ বিরোধী মাহমুদুর রহমানের মতো সাংবাদিক, বিবিসির এককালীন কর্মী সিরাজুর রহমানের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। সিরাজ লিখেছেন, ৩ লক্ষকে শেখ মুজিব ইংরেজিতে ৩ মিলিয়ন বলেছেন। সিরাজ এ মন্তব্য করে বঙ্গবন্ধুর ইংরেজি জ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করতে চেয়েছেন। সিরাজুর রহমানের বই পড়েছি। ইংরেজি নিশ্চয় ভালো জানেন লন্ডনে থাকার কারণে। বঙ্গবন্ধুর ইংরেজি ভাষণও পড়েছি। সিরাজুর রহমানের ইংরেজি এর চেয়ে উত্তম এমন দাবি করা যায় না। বাংলা গদ্য তো নয়ই। সিরাজুর রহমানে যে দৃষ্টিভঙ্গি তাতে তিন লাখও তার কাছে বেশি মনে হওয়া স্বাভাবিক। সংখ্যাটি ৩০ হাজার হলে বোধহয় তিনি সন্তুষ্ট হতেন।

এসএ করিমের প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকেও ডেভিড উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনিও লিখেছেন, ৩০ লক্ষ 'no doubt a gross exaggeration'। এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, প্রাভদায় সংবাদটি ছাপা হয়েছিল।

বার্গম্যান বলছেন, প্রাভদার হিসেবটা গোলমেলে [কমিউনিস্টদের কাগজ সে জন্য; ইহুদী বা ইউরোপীয়দের হলে না হয় মানা যেত] কারণ প্রাভদা লিখেছিল, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে [days immediately] ৮০০ বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়েছিল। আসলে ঠিক সংখ্যা হবে ২০।

বুদ্ধিজীবী নিধন শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ থেকে। এই বুদ্ধিজীবীর অন্তর্গত [দেখুন রশীদ হায়দার সম্পাদিত *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ*] বিভিন্ন পেশায় মানুষ। ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ২০ জন বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়েছে?

ফ্রস্টের সাক্ষাৎকারের পর পরই বঙ্গবন্ধু নাকি দু'টি কমিটি করেছিলেন মৃতের সংখ্যা জানার জন্য। কমিটি নাকি প্রাথমিক রিপোর্টও দিয়েছিল। সে রিপোর্টে নাকি ৫৭,০০০ জন মৃতের

খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। সেজন্য এরপর সরকার এ নিয়ে এগোয়নি। প্রশ্ন জাগে, নিয়াজি যে ১৫ লক্ষের কথা বলেছিলেন সেটি কি কারণে?

এরপর ডেভিড কলেরা হাসপাতাল, যা এখন আইসিডিডিআরবি নামে পরিচিত তাদের একটি জরিপের কথা উল্লেখ করেছেন মতলব থানায়। ঐ থানায় তাদের অনুমান ৮৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ঐ হিসাবে মৃতের সংখ্যা তারা ৫ লাখ বলে অনুমান করেছে। ২০০৮ সালে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল অনুসারে, ১৯৭১ সালে নিহতের সংখ্যা ১,২৫,০০০ থেকে ৫,০৫,০০০ জন। আর জে রুমেল বলছেন ১৫ লক্ষ আর শর্মিলা বোসের হিসাব অনুযায়ী ৫০ হাজার থেকে ১০০,০০০।

এরকম আরও কিছু হিসাব দিয়েছেন তিনি। উপসংহারে তিনি লিখেছেন, যে-কোনো সংঘাতে নিহতের সংখ্যা নিরূপণ করা মুশকিল- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি বেশি প্রযোজ্য এর 'পার্টিজান পলিটিকসে'র কারণে। এবং এ কারণে এ বিষয়ে স্বাধীন গবেষণা করা কঠিন। এটা ঠিক পাকিস্তানিরা অনেক হত্যা করেছে। মৃতের সংখ্যা যাই হোক সরকারের বর্তমান নীতি যে অপরাধীর বিচার তাতে [এ সংখ্যা] কোনো অভিঘাত হানবে না। তার ভাষায়

This is pity- as the number of civilians who were killed in atrocities by the Pakistan military in 1971 was without doubt, very high. Whatever might be the actual figure, it would not affect the government's current policy for the need for criminal accountability for these offences.

বার্গম্যান যে সব যুক্তি দিয়েছেন এগুলো যে খুব নতুন তা নয়। আমরা এর বিপরীতে যেসব যুক্তি দেব তাও নতুন নয়। রবার্ট পেইন সেই ১৯৭২ সালে যেমন *ম্যাসাকারে* লিখেছেন- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেছিলেন, "৩০ লক্ষ হত্যা করো বাকিরা আমাদের হাত থেকে খাবার খুটে খাবে।" এখন যদি বলি সামরিক বাহিনীর প্রধানের আদেশ মেনে তার সৈন্যরা ত্রিশ লক্ষ হত্যা করেছে তাহলে এ যুক্তি আসার এমন কথা কি বলা যাবে? *প্রাভদা* ইয়াহিয়ার কথার আলোকেও এই সংখ্যা উল্লেখ করে থাকতে পারে। মুক্তমনা ওয়েবসাইটে আবুল কাসেম একটি

ড্রইং. হাশেম খান. ২০১৪

প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, ১৯৮১ সালে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার জরিপে লেখা হয়েছে, বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে। প্রতিদিন গড়ে ৬ থেকে ১২ হাজার মানুষ মারা হয়েছে। গণহত্যার ইতিহাস এই হার সবচেয়ে বেশি। [Among the genocides of human history the highest number of people killed in lower span of time is in Bangladesh in 1971. An average of 6000 (six thousand) to 12000 (twelve thousand) people were killed every single day ... This is the highest daily average in the history of genocides.]

জাতিসংঘের হিসাব ধরে আবুল কাসেম একটি হিসাব করেছেন। তার মতে হত্যা হয়েছে ২৬০ দিন। সে হিসাবে জাতিসংঘের সর্বনিম্ন হিসেব ধরলে তা দাঁড়ায় ৬০০০ X ২৬০ = ১৫,৬০,০০০ বা ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার। আর সর্বোচ্চ মাত্রা ধরলে = ১২০০০ X ২৬০ = ৩১২০০০০ বা ৩১ লক্ষ ২০ হাজার। তার মতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ৪০% পরিবারের কেউ না কেউ মারা গেছেন এবং পাকিস্তানি প্রতিটি সৈন্য প্রতি (১০) দশ দিনে (১) একজন করে হত্যা করেছে। ১৯৭২ সালে *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক* লিখেছিল, বাংলাদেশে ৩০ লক্ষের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এখানে রাজাকার, আলবদর কর্তৃক হত্যা সংখ্যা ধরা হয়নি।

পাকিস্তানি সেনা অফিসার কর্নেল নাদের আলী যিনি ১৯৭১ সালে এখানে ছিলেন এবং গণহত্যা করে ও দেখে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন, লিখেছেন, তাকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, "মুজিবের জেলায় [হোম ডিস্ট্রিক্ট] যত বেজন্মাকে পাওয়া যায় তাদের হত্যা করো এবং কোনো হিন্দু যেন বাদ না যায়।" এ ধরনের আদেশ যখন দেয়া হয় তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা কি পরিমাণ হত্যা করতে পারে তা অনুমেয়।

শাহরিয়ার কবির একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন–

"মুক্তিযুদ্ধের পর সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা তাস বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় তদন্ত করে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ বলে ঘোষণা করেছে। স্যামুয়েল টটেন

সম্পাদিত 'সেঞ্চুরি অব জেনোসাইড' গ্রন্থে বাংলাদেশের গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ বলা হয়েছে।' *এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানাতেও* ৩০ লক্ষের কথা বলা হয়েছে। শুধু '৭১-এর ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে ঢাকায় নিহতের সংখ্যা সিডনির *মর্নিং হেরাল্ড* লিখেছে, ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ (২৯-৩-৭১), আর *নিউইয়র্ক টাইমস* লিখেছে- ১০ হাজার (২৯-৩-৭১)।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকার *সেন্ট লুইস পোস্ট*-এ (১-৮-৭১) যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষস্থানীয় সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোলান্ডে নাৎসিদের গণহত্যার পর এই হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সবচেয়ে নৃশংস। সরকারি হিসেব অনুযায়ী প্রথম চার মাসে ২ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ বাঙালি নিহত হয়েছে এবং ৬৫ লক্ষ শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর প্রতিনিধি সিডনি শ্যানবার্গকে ৩০ জুন '৭১ তারিখে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়। নয়া দিল্লী এসে তিনি ঢাকার কূটনীতিকদের বরাত দিয়ে বলেছেন, প্রথম তিন মাসে দুই থেকে আড়াই লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। সেই সময় ঢাকায় অবস্থানরত ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিংও মনে করেন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ হতে পারে।"

হত্যা ব্যাপকতা বোঝাতে বিদেশি সাংবাদিকদের আরো কিছু প্রতিবেদনের উল্লেখ করছি। লন্ডনের *গার্ডিয়ান* ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে লেখে- "A horrifying picture of slaughter and destruction met the journalist on an official visit over the past week. The scale of it went beyond imagination. No one will ever know the full truth but authoritative source put the figure of dead at 30,000 and others arrested that it was perhaps as high as half a million."

এটি হচ্ছে মাত্র ১৫ দিনের হিসাব। *গার্ডিয়ানের* ঐ একই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, খুলনায় এক সিনিয়ার সেনা অফিসার তাদের বলেছিলেন, যাকে পাচ্ছি তাকেই মারছি, লাশের হিসাব রাখি না–

"We killed every one who comes our way. We never bothered to count the bodies."

গার্ডিয়ান এক মাস পর আরেকটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল, দিনরাতে যে-কোনো সময় গ্রাম ঘেরাও করা হয় ... গ্রামবাসীদের হত্যা করা হয় মহিলাদের ধর্ষণ। মেয়েদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। হাজার হাজার গ্রামবাসীকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়।

"Villages have been surrounded at any time of the day or night and the frightened villagers ... have been slaughtered where they have been found ... women have been raped, girls carried off to barracks, unarmed peasants, battered or bayoneted by thousands."

লন্ডনে *নিউ স্টেটসম্যান* জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই উল্লেখ করেছে ৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে–

"No one can claim not to know what is going on in East Bengal. The corpses rot in the seen on color television ... soon, the corpses now lying in the sun will be lapped by the monsoon. Half a million people had already died, before the present cholera epidemic." [4.6.1971].

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস যখন লন্ডনের *সানডে টাইমসে* 'জেনোসাইড' শব্দটি ব্যবহার করে প্রতিবেদন লিখলেন, তখন সারা বিশ্বে হইচই পড়ে গেলো। তিনি তার বই *দি রেপ অব বাংলাদেশে* লিখেছেন, পূর্ববঙ্গে আমি যা দেখেছি, হিটলার ও নাজিদের সম্পর্কে পড়ে যা জেনেছি তা থেকেও ভয়ঙ্কর। আমার মানুষজনের ওপরই যা [গণহত্যা] হচ্ছে। আমার মনে হলো বিশ্বকে তা জানানো উচিত নয়ত বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব। ম্যাসকারেনহাস ১৪ এপ্রিল থেকে কয়েক দিন মাত্র ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। বলা চলে গণহত্যার মাত্র শুরু তখন। গণহত্যা যখন তুঙ্গে তখন যদি আসতেন এখানে, তাহলে কী লিখতেন জানি না।

গণহত্যা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, পুরো প্রদেশে প্রণালীবদ্ধভাবে হত্যা গণহত্যার আভিধানিক অর্থের সঙ্গে মিলে যায়। পরবর্তীকালে কুমিল্লায় ১৪ ডিভিশনের সদর দফতরে অবস্থানকালে জেনেছি কী সুচিন্তিতভাবে পুরো পরিকল্পনা করে তা কার্যকর করা হয়েছে। তার ভাষায়–

"Gradually the pattern of the killings began to emerge. Horrified Bengalis suddenly became aware that the West Pakistan army had launched a campaign of genocide in East Bengal."

The systematic pattern of the murders throughout the province matches exactly the dictionary definition of genocide. I was to learn later during my visit to the 14th Division Headquarters at Comilla with what beastility and throughness the campaign had been planned and was being executed.

উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন, পাকিস্তান সরকার যা বলতে চাচ্ছে এই গণহত্যা সম্পর্কে তার কোনোটিই যুক্তিযুক্ত নয়। নাজিদের মতো এই কাজটি করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে। এটি মূলত একটি রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক উত্তর। আর এই শাসকদের ধারাবাহিক একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিনাশ।

বাংলাদেশ ধর্ষণের এটিই বাস্তবতা। পৃথিবীর কোনো প্রচারণা তা আড়াল করতে পারবে না। তার ভাষায়–

"... the Nazi-style pogroms were intended, in the content of the ambitions of the present West Pakistani regime, as a military answer to what was essentially a political problem of its own making ... the obliteration of Bengali language and culture in the continuing purpose of the regime.

This is the reality of the rape of Bangladesh. Not all the propoganda in the world can hide it."

তিনি পাকিস্তানি এক সেনা অফিসারকে উদ্ধৃত করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে পরিচ্ছন্ন করতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর এ জন্য ২০ লক্ষ মানুষ হত্যা করতে হলে করা হবে এবং ৩০ বছর ধরে তা কলোনি করে রাখা হবে– "We are determined to cleanse East Pakistan once and for all of the threat of secession, even if it means killing off two million people and ruling the province as a colony for 30 years." কুমিল্লায় গণহত্যা নিজে দেখে তিনি লিখেছিলেন–

"For six days ... I witnessed at close quarters the extent of the killing. I saw Hindu haunted from village to village and door to door shut off hand ... I have heard the screams of men bludgeoned to death in the compound by the circuit house in Comilla. I have seen truckloads of human targets and those, who had the humanity to try to help them hunted off for 'disposal' under the cover of darkness and curfew. I have witnessed the brutality of kill and burn missions as the army units, after clearing out the rebels, pursued the pogrom in the towns and villages."

আমি ব্যক্তিগতভাবে *ন্যাশনাল জিওগ্রাফির* সংখ্যার সঙ্গে একমত। যখন ঐ সংখ্যা দেয়া হয় তখন দেশটি সবে স্বাধীন হয়েছে, মানুষের স্মৃতি দুর্বল হয়ে যায়নি। সে সংখ্যা গ্রহণীয়। আজ থেকে বছর ১৫ আগে আমি স্বরূপকাঠির এক গ্রামে গিয়েছিলাম। বরিশালের বাসা থেকে টেম্পোয় স্বরূপকাঠি তারপর হেঁটে প্রায় মাইলখানেক ভেতরে এক খালের তীরে গ্রামে পৌঁছেছিলাম। সেই গ্রামে মূলত হিন্দু চাষীরা বসবাস করেন। তারা জানালেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা সেখানে এসেও মানুষ হত্যা করেছে। এত অভ্যন্তরে ঢুকে যদি পাক বাহিনীরা হত্যা করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গাই হত্যাযজ্ঞ চলেছে। এ ছাড়া বেশি হত্যা করা হয়েছে রেলওয়ে ব্রিজ বা খাল/নদীর ওপর বা নদী তীরে। এসব জায়গায় মানুষ মেরে পানিতে ফেলে দিলে ঝামেলা চুকে যায়। চিহ্ন থাকে না। চিহ্ন না থাকলে হিসাবও থাকে

ড্রইং. হাশেম খান. ২০১৪

না। অন্যখানে হত্যা করলে গণকবর দিতে হয়, ঝামেলা। সবখানে যে গণকবর দেয়া হয়েছে তা নয়। গণহত্যার ছবি দেখলে তা বোঝা যায়। আরেকটি বিষয় আমাদের খেয়াল থাকে না, বিভিন্ন জেলায় অন্য জেলার মানুষজন ছিল। তাদের হত্যার পর তাদের আত্মীয়স্বজনরা জানতেও পারেনি। এসব লাশও সংখ্যা থেকে হারিয়ে গেছে। এতো গেল পাকিস্তানি হার্মাদদের হত্যার কথা। এর সঙ্গে রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি বাহিনী, বিহারিরা যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাতো বলা হয় না বা সেই সব সংখ্যা বলেন তার সঙ্গে যুক্ত হয় না। এসব হিসেব ধরলে ৩০ লক্ষ কমই বলা হবে।

এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে গিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে। সীমান্ত অতিক্রম করার সময় এবং শরণার্থী শিবিরে কত মানুষ মারা গেছেন সে হিসাব কিন্তু গণহত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে। এ রকম অনেক তথ্য-উপাত্ত ৩০ লক্ষ শহীদের পক্ষে দেয়া যায় কিন্তু আমি দেব না। কারণ, এগুলো কুতর্ক। বিশেষ উদ্দেশ্যে এ সব বির্তক উত্থাপন করা হয়। বলতে পারেন তাহলে আমি বিতর্কে যোগ দিচ্ছি কেন? না, যোগ দিতে চাইনি। কিন্তু অনেকে অনুরোধ করেছেন কিছু লিখতে এ কারণে যে, তা'হলে বার্গম্যানরা একই কথা বার বার বলবে। পুরনোরা না হোক, নতুনদের অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। অন্তত, তাদের যুক্তি যে উদ্দেশ্যমূলক এ বক্তব্যটি আসা উচিত।

কোনো গণহত্যারই নির্দিষ্ট সংখ্যা কখনও নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে-সব গণহত্যার সংখ্যা দেয়া হয়েছে তার সবগুলোই আনুমানিক। এই অনুমানের ভিত্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখা, বিভিন্ন প্রতিবেদন, অভিজ্ঞতা। যে দেশ/জাতি গণহত্যার যে সংখ্যা নিরূপণ করে তা মোটামুটি এ কারণে মেনে নেয়া হয়।

ফতে মোল্লা যেমন লিখেছেন, সংখ্যা একেবারে সঠিক হবে এমন কথা বলা যাবে না, মূল বিষয় হচ্ছে সংখ্যা আমরা ব্যবহার করি গণহত্যাটি বোঝার জন্য (to address the issue of genocide), তার ভাষায়, "All numbers are not absolute we do use arbitrary numbers extensively all the time in our lives."

কম্বোডিয়া থেকে রুয়ান্ডা, বা হলোকাস্ট থেকে ইন্দোনেশিয়া কোথায় চুলচেরা হিসাব দেয়া হয়েছে? সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ায় যে গণহত্যা চালিয়েছেন ১৯৬৫-৬৬ সালে, তাতে অনুমান করা হয় ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেটি মানা না মানা অন্য কথা, কিন্তু সুহার্তো কি পরিমাণ হত্যা করেছিলেন সেটিই মূল বিষয়। ধরা যাক, কেউ বললেন বাংলাদেশে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৫১৯ জন মারা গেছেন। তাতে কি আসে যায়?

সংখ্যা নির্দিষ্টকরণের পেছনে এক ধরনের রাজনীতি আছে। যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামে নাপাম দিয়ে যে গণহত্যা চালিয়েছে সেটিকে পাশ্চাত্যের কেউ গণহত্যা বলেন না, বলেন যুদ্ধ। কারণ, যুদ্ধ বললে হত্যার দায় হ্রাস পায়। দু'পক্ষে যুদ্ধ হলে তো মারা যাবেই। কিন্তু ভিয়েতনামে কি খালি যুদ্ধ হয়েছিল? নিরীহ সিভিলিয়ানদের হত্যা করা হয়নি বছরের পর বছর? সুহার্তোর হত্যা নিয়ে কখনও কথা বলা হয় না। ঐ গণহত্যা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ এ বিষয়ে কথা বলেন না, কারণ কাজটি আমেরিকার সাহায্যে করা হয়েছে। অন্যদিকে, কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্ব সোচ্চার কারণ, পলপট ছিলেন কম্বোডিয়া এবং মার্কিন বিরোধী। কমিউনিস্ট শাসন যে কত খারাপ তা বোঝানোর জন্য কম্বোডিয়ার পলপটের কথা বার বার আসে। বাংলাদেশ গণহত্যার ৩০ লক্ষ শহীদকে নিয়ে এতদিন কোন প্রশ্ন ওঠানো হয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হলে গণহত্যার চেয়েও বিচার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বার্গম্যান বা ক্যাডমান বা অন্য কেউ। কিন্তু তা ধোপে টেকেনি। গত নির্বাচনের পর থেকেই হঠাৎ গণহত্যার বিষয়টি তোলা হচ্ছে। এখানে আরও মনে রাখা উচিত, আমেরিকা এই নির্বাচন সমর্থন করেনি। হঠাৎ গত কয়েক মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিএনপি নেতা তারেক রহমান, খালেদা জিয়া প্রশ্ন তুলছেন। গণহত্যায় যে ৩০ লক্ষ শহীদ হয়নি সে কথা খালেদা জিয়া প্রথম বলেছেন যা আগে কখনও বলেননি। এখন ডেভিড বার্গম্যান বিদেশের কাগজে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এগুলো কি কাকতালীয়? না, এর পেছনে অন্য কোনো রাজনীতি আছে। তার আগে বলা দরকার কেন বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়টি এতদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল? এর একটি কারণ আমরা নিজে, অন্য কারণ, আমেরিকা পাকিস্তান, সৌদি আরব বা চীনের মনোভঙ্গি যার কথা আগেই বলেছি।

ড্রইং, হাশেম খান, ২০১০

এ পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও নির্যাতনের উপর আমাদের আরো গুরুত্ব দেয়া উচিত। যত আমরা ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও নির্যাতনের ওপর গুরুত্ব দেব তত ভবিষ্যত প্রজন্মের বিভ্রান্তি ঘুচবে, আমাদেরও। আর এ কারণেই বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী খুলনায় বাংলাদেশের প্রথম *গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর* গড়ে তুলছে। আর্কাইভ ও জাদুঘরের কাজ শুরু হয়েছে।

আমরা আশা করি একদিন মানুষের দানে এই আর্কাইভ ও জাদুঘর এক বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। দেশ-বিদেশের গবেষকরা এখানে গবেষণা করতে আসবেন। আর এই আর্কাইভ ও জাদুঘর প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেবে, স্বাধীনতা শুধু চার অক্ষরের শব্দ নয়। এর পেছনে আছে ৩০ লক্ষের বেশি শহীদদের রক্ত, ৬ লক্ষেরও বেশি নারীর অশ্রু, অগণিত নির্যাতিতের দুঃখ-বেদনা। মনে করিয়ে দেবে বিশ শতকে কোনো একটি দেশে এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ নিহত হননি, এত বেশি মানুষ আহত হননি, এক কোটি মানুষ শরণার্থী হননি। আর এ কারণেই আমরা প্রস্তাব করছি ২৫ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হোক। এ দিবস সারা বিশ্বে পালিত হলে বিশ্বব্যাপী শ্লোগান হবে– আর গণহত্যা নয়, আর নির্যাতন নয়। বিশ্বে বিরাজ করুক শান্তি।

আলোকচিত্র শিল্পীদের চোখে
গণহত্যা ও নির্যাতন

২৫ মার্চের কালোরাত্রি   সংগ্রহ

গণহত্যা : সিঁড়ির ওপরে লাশ *সংগ্রহ*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হল, বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। নির্বিচার ছাত্র-জনতা হত্যা। মার্চ, ১৯৭১ — *সংগ্রহ*

গণহত্যা, ঢাকায় *সংগ্রহ*

গণহত্যা, যশোর *সংগ্রহ*

একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযান।
অন্যদিকে বাঙালি নিধন, বুড়িগঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে বাঙালির লাশ।

আনোয়ার হোসেন

কাক খুবলে খাচ্ছে শহীদের দেহ — কিশোর পারেখ

অজানা শহীদ

হারুন হাবিব

গণহত্যা গণকবরের প্রস্তুতি *সংগ্রহ*

বধ্যভূমি *অন্তর্জাল থেকে*

বধ্যভূমি
অন্তর্জাল থেকে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পলায়নের আগে কাপুরুষোচিত নৃশংসতা দেখিয়ে পাক বাহিনী জেলে আটক শহরের গণমান্য ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলে রাখে তিতাসের তীরে — *রবীন সেনগুপ্ত*
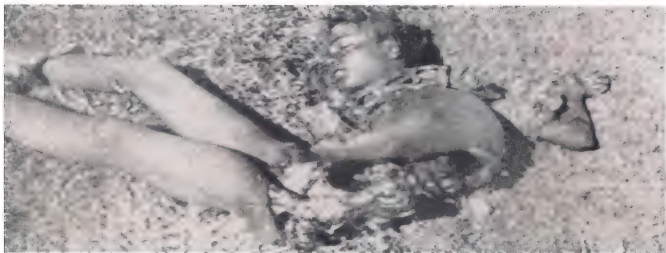
জল্লাদের খুবলে খাওয়া লাশ *সংগ্রহ*
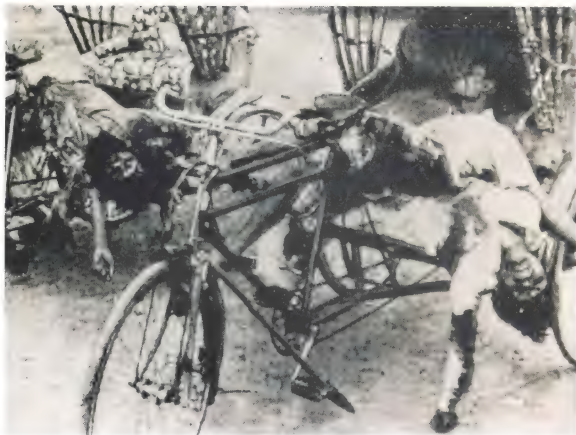
গণহত্যা সংগ্রহ

একদিন পোস্তগোলায় মুক্তিযুদ্ধের সহযাত্রী মনে করে একজন বাঙালি ড্রাইভারকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী। *আনোয়ার হোসেন*

শরণার্থীরা আক্রান্ত কলেরায়, তাদের লাশ পুঁতে ফেলা হচ্ছে যত্রতত্র। শকুন কুকুর অপেক্ষা করছে।

শ্যামাদাস বসু

শাঁখারী বাজার, ঢাকা, লাশ পড়ে আছে নর্দমার পাশে *কিশোর পারেখ*

বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে শাঁখারী বাজার

কিশোর পারেখ

রাস্তার পাশে পড়ে আছে লাশ *রঘু রাই*

খণ্ড-বিখণ্ড লাশ, ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে ট্যাঙ্ক সংগ্রহ

রায়েরবাজার বধ্যভূমি। এই স্থানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দোসর ও সহযোগী আলবদর ও রাজাকারেরা খ্যাতিমান ও নেতৃস্থানীয় অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী, চিকিৎসক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ঢাকা মুক্ত হওয়ার পর নিহতদের স্বজনরা বধ্যভূমিতে লাশ খুঁজছেন। *সংগ্রহ*

রায়েরবাজার বধ্যভূমি

রশীদ তালুকদার

রায়েরবাজার বধ্যভূমি *সংগ্রহ*

রায়েরবাজার বধ্যভূমি *অন্তর্জাল থেকে*

রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে লেখক-সাংবাদিক সেলিনা পারভীন *সংগ্রহ*
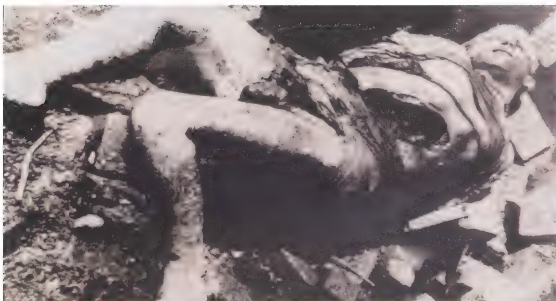
রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে ডাঃ ফজলে রাব্বী সংগ্রহ

রায়েরবাজার বধ্যভূমি *অন্তর্জাল থেকে*

গণকবর থেকে উদ্ধারকৃত কঙ্কাল, যশোর *হারুন হাবিব*

বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারকৃত কঙ্কাল *হারুন হাবিব*

বধ্যভূমি থেকে উদ্ধারকৃত কঙ্কাল *হারুন হাবিব*

এস. এম. শফি

অজানা শহীদ *সংগ্রহ*

যশোরের চাঁচড়া মুরগির ফার্মের মাটির নিচে পানির টাংকির ভেতর থেকে উদ্ধারকৃত কঙ্কাল *এস. এম. শফি*

স্বজন হারানোর বেদনা সংগ্রহ

গণকবর থেকে উদ্ধার করা কঙ্কাল, যশোর *এস. এম. শফি*

গণকবর থেকে উদ্ধারকৃত মাথার খুলি, যশোর *এস. এম. শফি*

পথের পাশে পড়ে থাকা লাশ কঙ্কাল হয়ে গেছে *এস. এম. শফি*
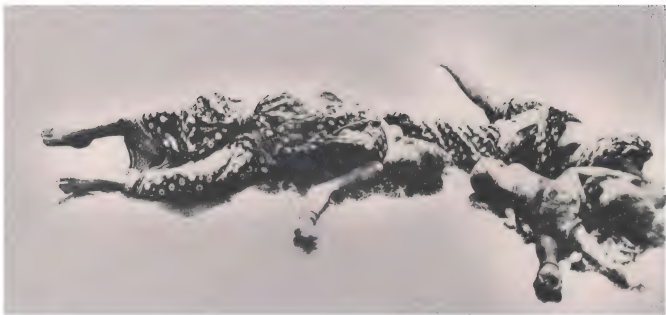
নির্যাতিত নারীর লাশ *অন্তর্জাল থেকে*

নির্যাতিত বৃদ্ধা, যশোর *এস. এম. শফি*

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা *কিশোর পারেখ*
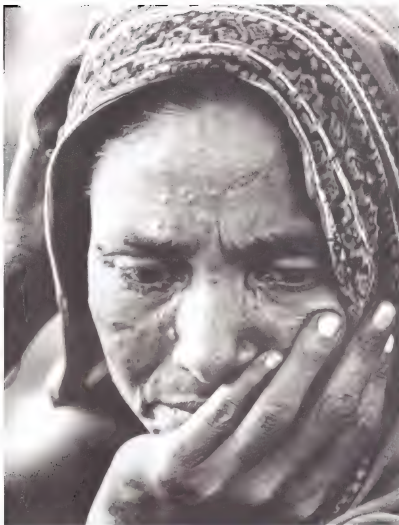
লাঞ্ছনা কিশোর পারেখ

হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্যাতিতা — *এস. এম. শফি*

লাঞ্ছনা — এস. এম. শফি

লাঞ্ছনা-নির্যাতন　　　　এস. এম. শফি

লাঞ্ছনা-নির্যাতন নাইব উদ্দিন আহমেদ

সীমান্তের দিকে শরণার্থী *রঘু রাই*

সামান্য আশ্রয় শরণার্থী শিবিরে *রঘু রাই*

জন্মভূমি ছেড়ে অজানা উদ্দেশে — রঘু রাই

পলায়নের পথও কন্টকাকীর্ণ রঘু রাই

শরণার্থী শিবিরে অসহায় নারীরা *হারুন হাবিব*

সীমান্তের খোঁজে　　　　　　রঘু রাই

শরণার্থীর যাতনা সংগ্রহ

আশ্রয়ের খোঁজে

রঘু রাই

আশ্রয়ের খোঁজে রঘু রাই

শরণার্থীর যাতনা

রঘু রাই

নিরাশ্রয় *রঘু রাই*

অসহায় কান্না — রঘু রাই

শরণার্থী শিবিরে রঘু রাই

যন্ত্রণা — রঘু রাই

ললাট লিখন — *রঘু রাই*

মা ও সন্তান : শরণার্থী শিবিরে — *রঘু রাই*

লাঞ্ছনা-নির্যাতন ১৯৭১ *সংগ্রহ*

সন্তান স্নেহ রঘু রাই

অসহায় ক্রন্দন

সংগ্রহ

আশ্রয় ও খাদ্য *সংগ্রহ*

শরণার্থী শিবিরে মৃত্যু *সংগ্রহ*

মৃত্যুর অপেক্ষা সংগ্রহ

মা ও শিশু : আশ্রয় শিবিরে *রঘু রাই*

শরণার্থী রঘু রাই

যাবো কোথায়? *কিশোর পারেখ*

শরণার্থী শিবিরে

রঘু রাই

ভয় সংগ্রহ

শরণার্থী সংগ্রহ

শরণার্থী *সংগ্রহ*

ক্লান্তি ও অপেক্ষা সংগ্রহ

শরণার্থী শিবিরে রঘু রাই

শরণার্থী — এস. এম. শফি

শরণার্থী শিবিরে শিশুদের খাবার সংগ্রহ *এস. এম. শফি*

*মাঝে মাঝে পাক সৈন্যরা গ্রামের আশেপাশে এসে এলোপাথারি গুলি করছে।
এই রকম মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আর শহরে মৃতদেহ স্তূপাকার*

ছবি: নিখিল ভট্টাচার্য

যশোরের চাঁচড়ার মোড়ের একটি দৃশ্যে। পাক ফৌজের ধ্বংসলীলা

ছবি: সেনগুপ্ত স্টুডিও (শ্যামল) শ্রীরামপুর

কী করার আছে? *রঘু রাই*

চিত্রশিল্পীদের চোখে গণহত্যা ও নির্যাতন

রিয়েলিটি শো-১৩, ক্যানভাসে এ্যাক্রেলিক : আনিসুজ্জামান মামুন

আমার দেশের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, ক্যানভাসে এ্যাক্রেলিক : উজ্জ্বল ঘোষ

গণহত্যা, গোপাল চন্দ্র সাহা

ওরা আসবে চুপিচুপি, মিশ্র মাধ্যম : তাহমিনা হাফিজ লিসা

বীরাঙ্গনা, ক্যানভাস এ্যাক্রেলিক : সুমন কুমার বৈদ্য

বীরাঙ্গনার আত্মকাহিনী, তেলরং : সিগমা হক অঙ্কন

অনুদানবের মৃত্যু উদ্বোধন, তেলরং : কামরুল হাসান
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ ১৯৭১, তেলরং : কামরুল হাসান
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

রাজাকার-আলবদরদের নামের তালিকা ১৯৭১, তেলরং : হাশেম খান
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

গণহত্যা, কাঠ-সিমেন্টের ভাস্কর্য : সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

একাত্তরের স্মরণে রিক্সা, ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য : হামিদুজ্জামান খান
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

নির্যাতন, কাঠের ভাস্কর্য : ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

নির্যাতন, সিমেন্টের ভাস্কর্য : আলাউদ্দীন আহমেদ বুলবুল
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

মধ্যরাতের ভয়ার্ত শহর, প্যাস্টেল: স্বপন চৌধুরী, ১৯৭১

শহরে কালোরাত্রি, কাগজে অয়েল প্যাস্টেল: স্বপন চৌধুরী, ১৯৭১

বীরাঙ্গনা '৭১, কলম ও কালি: সমরজিৎ রায় চৌধুরী

বীরাঙ্গনা, মিশ্র মাধ্যম : মাহমুদুল হক

একটি জাতির জন্ম, এচিং : মনিরুল ইসলাম

এই হত্যা বন্ধ করো, ড্রইং : আব্দুশ শাকুর শাহ্

বুদ্ধিজীবী হত্যা, তেলরং : শাহাবুদ্দিন

বিষাদ, মিশ্র মাধ্যম : নাজলী লায়লা মনসুর

'৭১-এ মায়ের কান্না, ফরিদা জামান

২৫ মার্চের কালোরাত্রি অতঃপর, তৈলচিত্র: মোহাম্মদ ইউনুস

জেনোসাউড ১৯৭১, কালো রং ও তুলি: কাজী রকিব

বুদ্ধিজীবী হত্যা, জলরং: নাসরীন বেগম

বীরাঙ্গনা, কালো রং ও তুলিঃ ঢালি আল-মামুন

শরণার্থী '৭১, এ্যাক্রেলিক অন ক্যানভাস : কনকচাঁপা চাকমা

শরণার্থী, তেলরং : মোঃ মনিরুজ্জামান
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

গণহত্যা ১৯৭১, ভূপেন সেন

১৯৭১, কাপড়ে বাটিক : সাধন মজুমদার
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
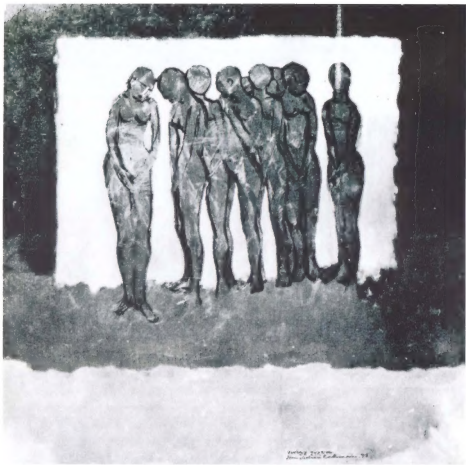
বীরাঙ্গনা ১৯৭১, তেলরং : হামিদুর রহমান

রাজারবাগ ১৯৭১, কোলাজ : মতলুব আলী
সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর